বিশ্বপরিবেশ ও মানুষ

সুধাংশু পাত্র



বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৯১
জুন, ১৯৮৪

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ :
আশ্বিন, ১৩৯৪
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
সন্ধ্যারাণী পান
আদ্যাশক্তি এণ্টারপ্রাইজ
৩২/২, সাহিত্য পরিষৎ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ২০ টাকা
Rupees : Twenty only

উৎসর্গ

বড়দা

শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ পাত্র

শ্রীচরণকমলেষু ।

ভূমিকা

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা আরও কিছু পরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, পৃথিবীতে ধীরে ধীরে যেন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, গাছগাছড়ার বৃদ্ধি হচ্ছে ব্যাহত, কিছু কিছু জীব ও উদ্ভিদ হারিয়ে যাচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তখন তাঁরা এর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হলেন এবং অচিরে বুঝতে পারলেন, এসবের মূলে আছে একমাত্র দূষণ। তাই দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তাঁরা ১৯৭২ সালের ৫ই জুন মিলিত হয়েছিলেন সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে।

বিশ্বব্যাপী এখন আরম্ভ হয়েছে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা। যেভাবে দিনের পর দিন আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে তাতে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই আজ উদ্বিগ্ন। তাই ১৯৭২ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহুত হচ্ছে সম্মেলনের পর সম্মেলন। পৃথিবীর মানুষ যাতে আপন পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে তার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও কর্মসূচীর পর কর্মসূচী প্রণয়ন করে চলেছে। ইউনেস্কোর মাধ্যমেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এর গুরুত্ব চিন্তা করে ৫ই জুন দিবসটিকে "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" রূপে চিহ্নিত করেছে।

ভারতও এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত দায়িত্ববোধ জাগরিত করার জন্য তারও চেষ্টার ত্রুটি নেই। প্রতি বছর এখানে ওখানে বসছে আলোচনা সভা এবং প্রকাশিত হচ্ছে পুস্তক-পুস্তিকা। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ আলোচনাই বিদেশী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। বিদ্যালয়স্তরে পাঠ্যসূচীতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় যতটুকু অন্তর্ভুক্ত তাতেও অনুসন্ধিৎসু মন তৃপ্তিলাভ করতে পারে না বা জনসাধারণকে সচেতন করানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। মানুষকে সচেতন ও সংস্কারমুক্ত করার জন্য, যোগ্য নাগরিক গড়ার জন্য মাতৃভাষায় এখনই কিছু কিছু পুস্তক রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান পুস্তকখানি তারই দীন প্রচেষ্টা মাত্র।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, পুস্তকটি এক বছর আগেই প্রকাশিত হতো। সেই সময় হঠাৎ একদিন জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক "জ্ঞান বিচিত্রার" সম্পাদক মাননীয় দেবানন্দবাবুর চিঠি থেকে জানলাম, তাঁরা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি অবলম্বনে জ্ঞানবিচিত্রার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। একটা লেখাও চেয়ে পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন গুণীজনের কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য লাভের আশায় পাণ্ডুলিপিটির একটি বিশেষ অংশ জ্ঞানবিচিত্রার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে একটু অপেক্ষা করে গেলাম।

জ্ঞানবিচিত্রার বিশেষ সংখ্যাটি আমার যথেষ্ট উপকারে এসেছে। সেজন্য দেবানন্দবাবু এবং পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কালিন্দী

সুধাংশু পাত্র

লেখকের বিজ্ঞান-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ ঃ—

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী
ভারতের বিজ্ঞান সাধক
আবিষ্কারের কাহিনী
প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও সমকালীন অন্যান্য দেশ
পৃথিবী মানুষ ও মহাকাশ
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
পৃথিবী পরিচয়
উদ্ভিদ রাজ্যের খবর
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
জীবজন্তুর গপ্‌পো
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
জীবজগতের বিস্ময়

জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ ঃ—

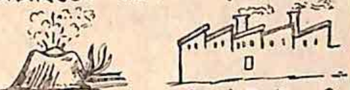
জননী কথা
বাংলার বীর বিদ্রোহী

সূচীপত্র

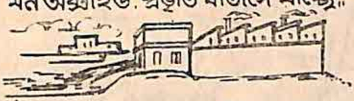
পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ ও তার ফল



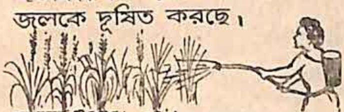
১। বন ধ্বংসের ফলে বাতাসে কার্বণ ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে।



২। কয়লা, তেল, গ্যাস, কাঠ, ঘুঁটে, ইত্যাদি জ্বালানোর ফলে বাতাসে কার্বণ ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বণ মন অক্সাইড, প্রভৃতি বাতাসে যাচ্ছে।



৩। কলকারখানা থেকে নির্গত পদার্থ জলকে দূষিত করছে।



৪। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত কীটনাশক দ্রব্য থেকে নির্গত ক্লোরিণ জল মাটিকে দূষিত করছে।



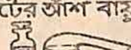
৫। গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ধূলিকণা বাতাসকে দূষিত করছে।



৬। কাঁচ, কাগজ, ধাতুর টুকরো, অসাবধানে রাখা তেল, বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি মাটিকে দুষিত করছে।



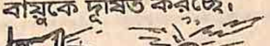
৭। তুলা ও পাটের আঁশ বায়ুতে মিশছে



৮। রাসায়নিক পদার্থ তৈরীর কারখানা থেকে বিবিধ জিনিষ মাটি, বায়ু ও জলকে দূষিত করছে।

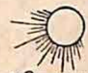


৯। খাদ্যে ও প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহৃত রং ও গন্ধ বায়ুকে দূষিত করছে।



১০। উচ্চ শব্দ পরিবেশকে দূষিত করছে।

১। বাতাসে, জলে ও মাটিতে অবাঞ্ছিত পদার্থ যুক্ত হওয়ায় নানা রকম রোগ ছড়াচ্ছে



২। নাইট্রোজেনের অক্সাইড, ধূলিকণা ইত্যাদির ফলে সূর্যের তাপে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।



৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও ঊর্ধ্বাকাশে ওজোনের স্তরে আঘাত করে।



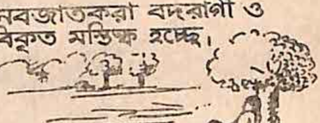
৪। আমাদের খাদ্যচক্রে অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটছে।



৫। ক্যানসার জাতীয় মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করছে।



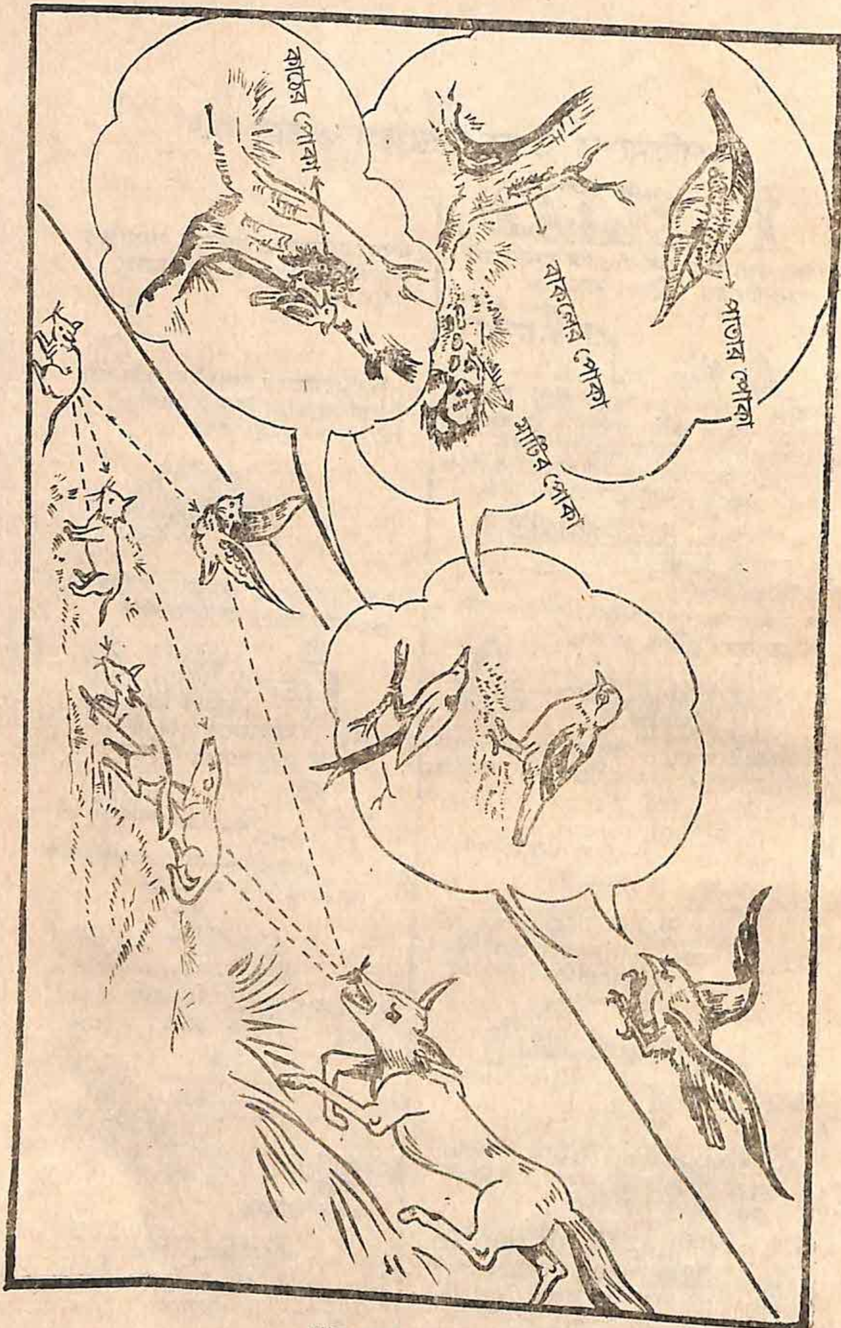
৬। নবজাতকরা বদরাগী ও বিকৃত মস্তিষ্ক হচ্ছে।



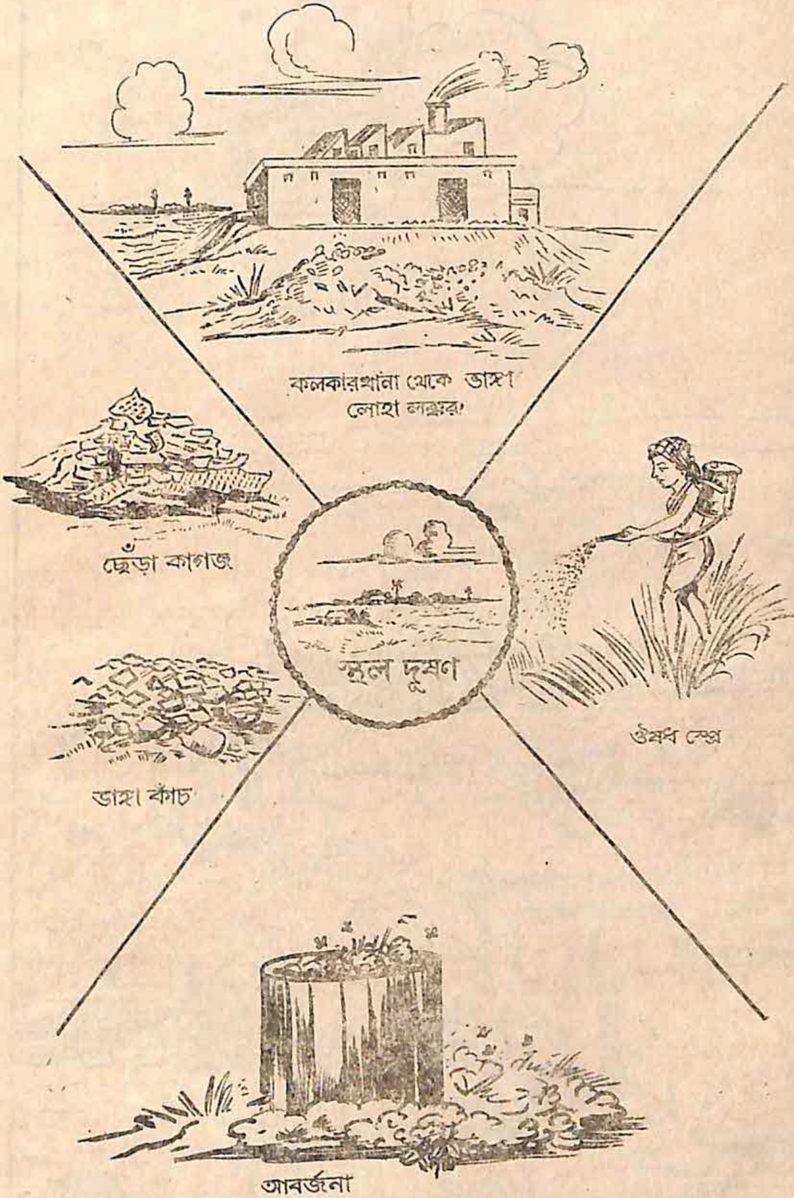
৭। কার্বণ ডাই অক্সাইড ও ধুলিকণার পরিমাণ বাড়ায় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

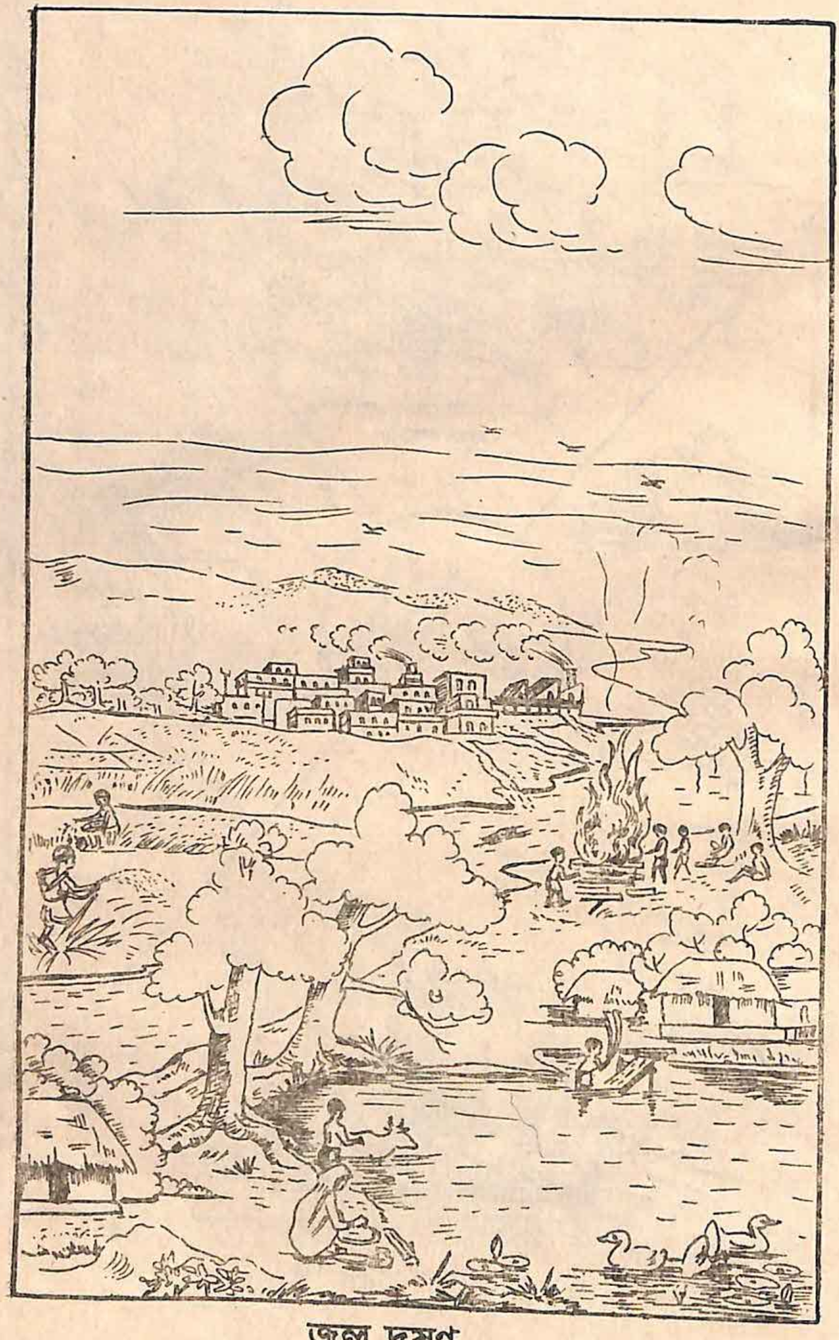


৮। বন্যজন্তু ও গাছপালা বিপন্ন হচ্ছে।

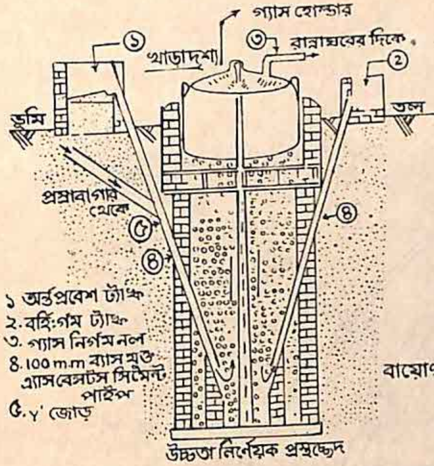


খাদ্য-খাদক সম্পর্ক


কলকারখানা থেকে ভাঙ্গা
লোহা লক্কর
ছেঁড়া কাগজ
স্থল দূষণ
ঔষধ স্প্রে
ভাঙ্গা কাঁচ
আবর্জনা

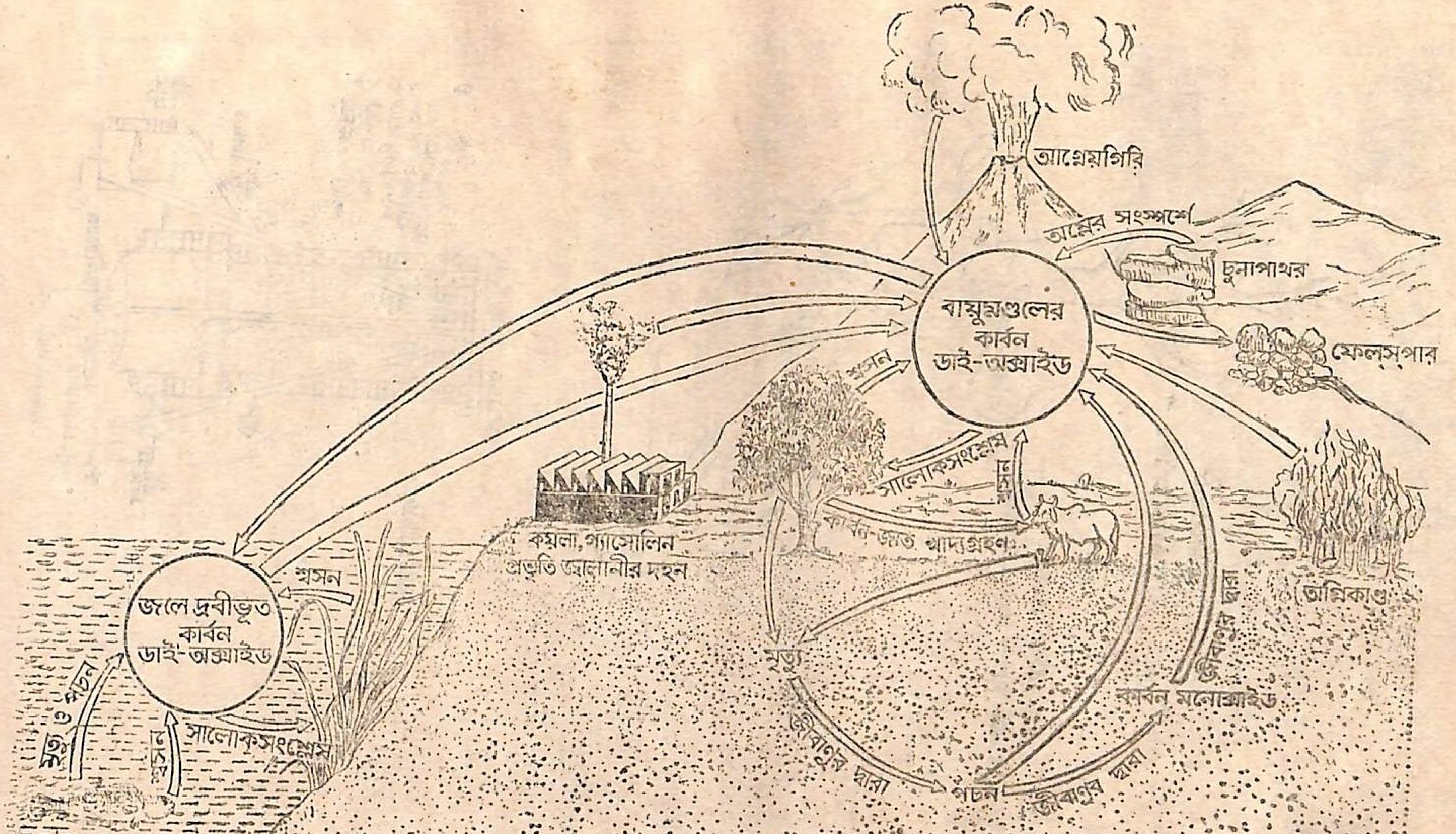


জলে দূষণ


গ্যাস হোল্ডার
খাড়াদৃশ্য
রান্নাঘরের দিকে
ভূমি
তল
প্রস্রাবাগার থেকে
১ অর্ন্তপ্রবেশ ট্যাঙ্ক
২. বর্হিঃগম ট্যাঙ্ক
৩. গ্যাস নির্গম নল
৪. 100 m.m ব্যাস যুক্ত এ্যাসবেসটস সিমেন্ট পাইপ
৫. Y' জোড়
উচ্চতা নির্ণয়ক প্রস্থচ্ছেদ

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

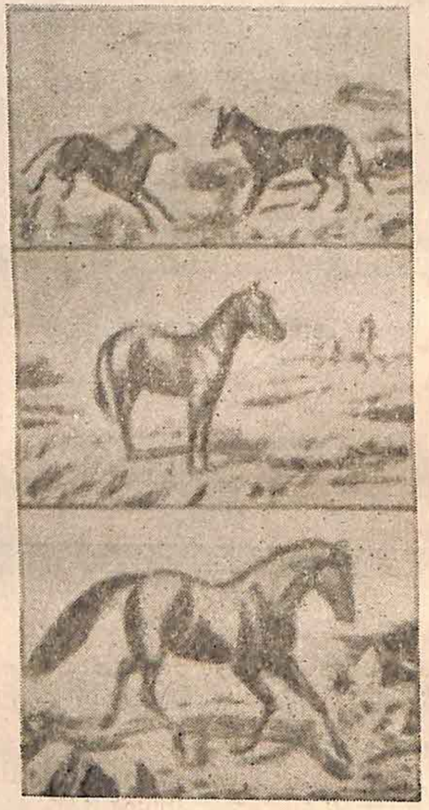

সূর্য্য
কার্বন ডাই অক্সাইড
খাদ্য
সূর্যের আলোতে পত্ররন্ধ্র খুলে যায় ও সালোক সংশ্লেষ হয়
জল ও গাছের খাদ্যরস


আগ্নেয়গিরি
অম্লের সংস্পর্শে
চুনাপাথর
বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড
ফেলস্‌পার
শ্বসন
সালোকসংশ্লেষ
কার্বন-জাত খাদ্যগ্রহণ
কয়লা, গ্যাসোলিন প্রভৃতি জ্বালানীর দহন
অগ্নিকাণ্ড
জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড
মৃত্যু ও পচন
মৃত্যু
জীবাণুর দ্বারা
পচন
কার্বন মনোক্সাইড



ডাইনোসোরের কঙ্কাল





বিভিন্ন যুগে ঘোড়া

প্রকৃতির নিয়ম শৃঙ্খলা ঃ

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী স্বয়ং "বিষ্ণু"ই হোন অথবা অন্তর্নিহিত কোন মহান শক্তির জন্যই হোক বিশাল মহাবিশ্ব এক কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নেই। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে পরিক্রমারত অসংখ্য নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির অন্তর্গত নক্ষত্ররাও স্থির নয়। তারাও নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে এবং পরিভ্রমণ করছে গ্যালাক্সির চারদিকে। অপর পক্ষে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে গ্রহরা এবং গ্রহদের বন্দনারত উপগ্রহরা। কেবল তাই নয়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পৃথিবী যেহেতু একটা গ্রহ এবং তাকে মহাবিশ্বের যাবতীয় নিয়ম পালন করতে হচ্ছে, তাই তার সংসারে যাদেরই অবস্থান তারা সবাই নিয়মের অধীন। জীব ও উদ্ভিদ তো বটেই, জড়রাও বহির্ভূত নয় সেই নিয়মের আওতা থেকে। প্রবহমান নদীর স্রোত, ঝর্ণার অবিরাম কল কল ধ্বনি, অরণ্যের শ্যাম শোভা, ফুলের মাধুরী, পাখীর কাকলি, সবার মধ্যে আছে নিয়ম শৃঙ্খলা। এমনকি পার্থিব সকল শক্তির মূলাধার ঐ সূর্যকিরণের মধ্যেও।

স্থলভাগের বৃষ্টির বারিধারাকে নদী বহন করে নিয়ে যায় সাগরে। আর সূর্যের কিরণে সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে ফিরে যায় আকাশে। মেঘ জমে, বারি ঝরে, পুনরায় নদী তাদের পৌঁছে দেয় সাগরে। যেন এক চক্রপথ।

বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে বাধা পায়। বেরিয়ে আসে ঝর্ণার আকারে। তারপর ওরাও মিশে যায় সাগরজলে। সূর্যকিরণের দ্বারা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে অঙ্গার গ্রহণ করার জন্য পাতায় সবুজকণার অবস্থান। তাইতো পান্নার সাজ পরে গাছপালা। খাদ্য তৈরির জন্য সে কেবল কার্বনকে নেয় আর বাতাসকে উপহার দেয় অক্সিজেন। জীবজগৎ ও উদ্ভিদরা শ্বাসকার্যের জন্য গ্রহণ করছে অক্সিজেন আর বাতাসে ঢালছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। এখানেও সেই চক্রপথ।

ফুলের এত শোভা, পাখীর এমন মন-মাতানো গান, এদের মধ্যে নিহিত আছে বংশরক্ষার তাগিদ। কেউ হারিয়ে যেতে চায় না, প্রকৃতিও চায় না কাউকে নিঃশেষ করে ফেলতে। সবাই বেঁচে থাকে আপন সন্তানের মধ্যে। আর জড়রা রূপান্তরের মাধ্যমে নব নব রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। ফুল ফোটে, ফুল থেকে ফল হয়, ফল থেকে জন্ম নেয় গাছ। সেই গাছ আবার একই ধরনের ফুল ও ফল প্রসব করে। জীব আপন আকৃতির সমান সন্তানের জন্মদান করে। সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় পিতামাতার বৈশিষ্ট্য। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। জীবের দেহটার বিনাশ ঘটলেও পরোক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে তার বিনাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে সে অমর, সে অবিনশ্বর। এখানেও চক্রপথ।

বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথাও যদি ধরা যায় তাহলেও দেখা যাবে, এতবড় যে শক্তিমান ও মহাদীপ্তিমান নক্ষত্র—সেও নিভে যায় চিরতরে। ধ্বংস হয়ে যায় তার গ্রহজগৎ। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে নিহিত থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। বিশাল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার প্রসারণও চিরকাল অব্যাহত থাকবে না। একদিন শুরু হবে সঙ্কোচন। সঙ্কোচন

যখন চরমে উঠবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু, তখন আবার আরম্ভ করবে প্রসারিত হতে। পুনরায় নব নব নক্ষত্রজগৎ সৃষ্টিতে ব্যাপৃতা হবেন বিশ্বপ্রকৃতি। সবই সেই চক্রক্রম।

অকল্পনীয় মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্যজাল ভেদ করা মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে। শুধু জানা গেছে, তার প্রতিটি আঙ্গিনায় নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। পৃথিবী যত ক্ষুদ্র আর যত তুচ্ছ হোক না কেন নিয়ম তাকেও পালন করতে হচ্ছে। আর পৃথিবীর মানুষ ?

মা যখন স্বেচ্ছানুবর্তিনী নন, কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা, তখন তার সন্তানদেরও হাত-পা বাঁধা। তাদেরও পালন করতে হচ্ছে নিয়ম। সে নিয়ম পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার নিয়ম, তাদের বেঁচে থাকার এক-মাত্র হাতিয়ার। পার্থিব পরিবেশও স্থানুর মত নয়। তাকেও যথা নিয়মে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। সে পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম ও অতি মন্থর। চক্রপথে আবর্তিতও হচ্ছে। কোথাও জেগে উঠছে মরুভূমি আবার কোথাও মরুভূমির বুকে জেগে উঠছে নতুন প্রাণ স্পন্দন। মেরুদেশের পরিবর্তন হয়, নদীর একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে, নতুন দ্বীপের জন্ম হয়, পুরাতন কত দ্বীপ হয় জলমগ্ন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির কোন কোন কাজ খেয়ালিপনা বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রতিটির ক্ষেত্রে আছে কার্যকারণ সম্পর্ক। অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূত নয়। চিরকাল যা ঘটে চলেছে ভবিষ্যতে তা ঘটতে থাকবে। বোধ হয় ব্যতিক্রম ঐ মানুষ জাতটা। নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা কেবল তারই। তার কুশাগ্রবুদ্ধি এবং স্বার্থপর মনোভাবই প্ররোচিত করেছে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে। যুগে যুগে তাই চিন্তাশীলরা মানুষের চলার পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন, মানবিক গুণাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সমাজের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন।

এত জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয় যে, নিয়ম রক্ষার মূলে আছে তার নিজেরই বাঁচার তাগিদ। সে বুদ্ধির জোরে পৃথিবী জয় করেছে। তার সভ্যতার নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে নিবিড় বন,

মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং সাগরতল। কলুষিত হচ্ছে পৃথিবীর মাটি, জল ও হাওয়া। পরিত্রাহি চিৎকার জুড়েছে জীবজন্তু, গাছপালা। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মকানুনের সংখ্যা বড় কম নয়। বড় ভয়ঙ্কর সে সব নিয়ম। মানুষ বুদ্ধিবলে জেনে নিয়েছে তাদের অনেক কিছু এবং অতিক্রমও করতে চাইছে। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে অতিক্রম করে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে নদীর দুর্বার স্রোতকে রুদ্ধ করছে, আকাশের জলদ মেঘকে নামিয়ে এনে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে, সার প্রয়োগের দ্বারা অধিক ফসল ফলাচ্ছে, অরণ্যকে ধ্বংস করে নগরের পত্তন করছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে তোলপাড় করছে, এমনই আরও কত কি ? কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়ার আছে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া। আবার নিয়ম ভাঙ্গার পরও নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হয়। বিশেষ নিয়মগুলির দ্বারা পরিচালিত কোন রাজ্যে নতুন নিয়ম আরোপিত হলে সর্বত্র যেমন একটা চাঞ্চল্য কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মানিয়ে চলতে না পারলে বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। যতক্ষণ না গা-সওয়া হচ্ছে ততক্ষণ প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকবে।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করতে পারছে বলে মানুষের আত্মতৃপ্তির কোন হেতু নেই, উল্লসিত হওয়ারও কারণ নেই। দৈব শক্তির অধিকারী মনে করে গর্ব করাও বৃথা। সুস্থভাবে চিন্তা করলে মনে হবে, এ যেন ভয়ঙ্করের সূচনা অথবা মহাবিপ্লবের সূত্রপাত।

এক আধটু পরিবর্তনে অবশ্য কোন ক্ষতি হয় না। প্রচুর নিয়মের মধ্যে একটির সামান্য রদবদল একেবারে নিয়মমাফিকভাবে প্রকৃতি শুধরে নেয়। সে পরিবর্তন অবশ্য ক্ষমতার মধ্যে হওয়া চাই। রোগ-জীবাণুদের প্রশমিত করতে দেহে যেমন নতুন নিয়ম তথা অ্যান্টিবডি গঠিত হয়, অথচ আক্রমণ জোরদার হলে ব্যর্থ হয় বাধা দিতে—তেমনই যদি বড় রকমের পরিবর্তন আসে তখন প্রকৃতিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

যেহেতু আজ পরিবর্তনের সবেমাত্র সূচনা। শুরুতে সাবধান হতে পারলে বিপ্লব দাবানলের আকার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে তুষের আগুনের মত যেটি ধিকি ধিকি করে জ্বলছে সামান্য একটু জলের ছিটে দেওয়ার মত অচিরেই নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতএব আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, যে সময় আমাদের সবারই জানার দরকার প্রাকৃতিক নিয়মকানুনগুলিকে। সবাইকে একযোগে সচেষ্ট হতে হবে নিয়মকানুনগুলি রক্ষা করতে। তবেই বজায় থাকবে আমাদের গতি, অটুট থাকবে আমাদের বংশধারা।

আজকাল বয়স্কদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সবই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার আফসোসের সুরে বলেন "ঘোর কলি! আমাদের ছেলেবেলায় এত ঘন ঘন খরা বন্যা আসতো না। নিয়মিত বৃষ্টিপাত হতো, সার না দিয়েও একরে চল্লিশ মন ধান কেটেছি। আর আজ! খরা লেগেই আছে। সুবৃষ্টি আদৌ হচ্ছে না। আষাঢ়ের কর্দমাক্ত পথঘাট, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণ, কার্তিকের প্রথম দিকে সাধারণভাবে এক পশলা বৃষ্টি, এ যেন কবে ভুলে গেছি। শুধু কি বৃষ্টি? এক এক বছর আশ্বিনের শেষেও গুমোট থাকে, অগ্রহায়ণের ভোরেও গায়ে চাদর জড়ানোর দরকার হয় না, হাড় কাঁপানো শীতও পড়ে না আগেকার মত।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে তাঁরা যদি স্মরণ করেন তাহলে একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে দেশে বন এবং গাছপালার সংখ্যা ঢের বেশী ছিল। শহরে শহরে এত কলকারখানা ও বাস-লরি ছিল না। অঢেল ছিল পোড়ো জায়গা। বড় বড় গাছ থেকে আরম্ভ করে ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল পল্লীর পথঘাট। সেদিন যে সব জায়গায় দিন দুপুরে শেয়াল ডাকতো, ভেতরে ঢুকতে গা ছমছম করতো আজ সেখানে চাষের জমি নয়ত রাতদিন বিজলী বাতি জ্বলছে।

জনসংখ্যার চাপে পতিত জমি একটুও রাখলাম না, দাম পেয়ে এবং আসবাবপত্রের চাহিদা মেটাতে বড় বড় গাছ কেটে লোপাট করে

দিলাম, শিরীষ প্রভৃতি গাছের কাঠ—যার আদৌ চাহিদা ছিল না তাকেও কাজে লাগালাম। অতএব সুবৃষ্টির আশা করবো কেমন করে? বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বড় বড় গাছ বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে বলে আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা রাখে, জলদ মেঘকে আকর্ষণও করতে পারে। অতএব প্রকৃতির নিয়মগুলো আপনা হতে ভাঙ্গছে বলা যায় না। আমরা নিয়মভঙ্গ করছি, আর প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায় নিয়ম মাফিক নিয়ম প্রযুক্ত হচ্ছে।

অপরদিকে গাছপালার সংখ্যা যেমন হ্রাস পেয়ে চলেছে তেমনই দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা এবং তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে কলকারখানার সংখ্যা। শহরে বন্দরে তো দূরের কথা সুদূর পল্লীতে পল্লীতেও ভক্ ভক্ করে কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে ধানভাঙ্গা ও জল তোলার কল, কাঠের বদলে উনানে পুড়ছে কয়লা। অতএব বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। ওকে শুদ্ধ করার জন্য যে পরিমাণ গাছপালার দরকার, তা প্রকৃতির ভাণ্ডারে নেই। উক্ত কারণে পরিবেশ তো গরম হবেই! (অবশ্য অন্য কারণও আছে—যা পরে আলোচনা করা হয়েছে।) হিসেবে দেখা গেছে বিগত দশ বছরে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ০·০০১২ ভাগ। সেই কারণে এবং বায়ুমণ্ডলে ধূম ও ধূলির পরিমাণ বাড়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়েছে ০·১৪° সেন্টিগ্রেডের মত। পরিমাণটা যদিও নগণ্য তবু বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এইভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণের মত হয়ে পড়বে। আজ এত অল্পেই যদি এমন বিপর্যয়ের সূচনা হয় তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে পার্থিব পরিবেশটা কেমন হবে?

কল্পনা করতে ক্ষতি নেই, কল্পনা মানুষে অনেক করে। ধরা যাক, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পরের দিনগুলির কথা। সেদিন গাছপালার আরও বিলুপ্তি ঘটবে, শহরের সংখ্যা বেড়ে উঠবে, হয়ত হাজার কোটিতে গিয়ে পৌছবে পৃথিবীর জনসংখ্যা, কলকারখানায় ছেয়ে

যাবে পৃথিবীর বুক, আরও বিষিয়ে উঠবে পৃথিবীর বায়ু, প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠবে পৃথিবীর পরিবেশ, ভাবতে যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মানুষের অমরত্ব তার উত্তরপুরুষদের উপরই নির্ভর করছে। সেই উত্তরপুরুষদের আমরা কি দিয়ে যাচ্ছি। বুক ভরা বিষ! সেই বিষ পান করে তারা কি নীলকণ্ঠ হতে পারবে? অথবা বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে?

কবির কথায় আমাদের এখনই "অঙ্গীকার" করতে হবে, যাতে "নবজাতকদের কাছে পৃথিবীকে বাস যোগ্য" করে তুলতে পারি। তা না হলে আমাদের ধন, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষার এইখানেই সমাধি।

জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সাম্যভাব :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কবির উক্তিকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। খোঁজ করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ জগতের একজনও কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এককভাবে কারও বাঁচার উপায় নেই, পরিবেশের সবার সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা। তাই একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের ধ্বংসে অপরেরও বিলুপ্তির সম্ভাবনা। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, একের জীবন অপরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে এবং জড়িয়ে রয়েছে বলে সর্বত্র একটা সাম্যের ভাব বিদ্যমান। তাই বলতে হয়,

সদা সাম্য, সদা স্থির,
সদা নির্ভরতা।
প্রকৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে
সর্বত্র সমতা।

ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। গাঁয়ের মাঝখানে ছিল কোন এক জমিদারের পরিত্যক্ত কাছারি বাড়ী। ভুতুড়ে বাড়ী বলে মানুষজন কাছেও ঘেঁষতো না। চারপাশ ছিল ঝোপঝাড়ে ভর্তি, শেওলাপড়া কালো-দেওয়ালে বট আর অশ্বত্থরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সাপ-খোপ, চামচিকে-বাদুড়, শেয়াল-খাটাস ও লক্ষী পেঁচাদের আবাস হয়ে উঠেছিল জায়গাটা।

সন্ধ্যে হলেই যে যার শিকারে বেরিয়ে যেতো। শুধু লক্ষী পেঁচারা গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতো না। দুধের মত সাদা, হাঁটু সমান উঁচু ওরা সন্ধ্যে হলে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসতো এবং বড় বড় নারকেল গাছের

মাথায় এবং এর তার চালার উপর ঝাঁক বেঁধে বসে চিৎকার ও চেঁচামেচি জুড়ে দিত। সে চেঁচামেচি চলতো সারারাত ধরে। যেহেতু লক্ষ্মীর বাহন ওরা, তাই গাঁয়ের লোকে কিচ্ছুটি বলতো না তাদের। বরং গাঁয়ে বাস করে বলে তৃপ্তি অনুভব করতো।

লক্ষ্মী পেঁচারা সারারাত চষে বেড়াতো গাঁটাকে। সকালে যেখানে সেখানে, রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতো গণ্ডা গণ্ডা কোলা ব্যাঙ ও ইঁদুরের হাড়-গোড়-মাথা ইত্যাদি। সেগুলোকে আবার পরিষ্কার করতে রাজ্যের যত কাক এসে জড় হতো আর চিৎকারে পাড়া মাৎ করে দিতো। সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করতো গ্রামবাসীরা।

লক্ষ্মী পেঁচাদের প্রতি গাঁয়ের মানুষের সংস্কারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদের দ্বারা গাঁয়ের একটা মহৎ উপকার সাধিত হতো। ইঁদুরের বংশকে ধ্বংস করে রক্ষা করতো বহু ফসলকে। পরের দিকে যখন গাঁয়ের এক ধনবান ব্যক্তি পোড়ো জায়গাটাকে কিনে সাফ করে ফেললেন তখন কোথায় উধাও হয়ে গেল লক্ষ্মী পেঁচারা। রাতে আর ঘুমের ব্যাঘাত হল না কারুর। তবে বছর খানেকের ভেতরে ইঁদুরের বংশটা এত বেড়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত খাবারে বিষ দিয়ে মারতে হয়েছিল তাদের। ইঁদুরকে মারতে গিয়ে মারলো কিছু বেড়ালকে। অসাবধানে রাখার জন্য একটি ছেলে মরেছিল, পাড়ার এক বউ শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে হাতের কাছে বিষ পেয়ে আত্মহত্যাও করেছিল।

গাঁয়ে এখন আর সেই সাদা সাদা লক্ষ্মী পেঁচা দেখা যায় না। বিষ দিয়েই ইঁদুর মারতে হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটছে।

প্রকৃতির রাজ্যটা বড় অদ্ভুত। আপন নিয়মে সে সাম্য বজায় রেখে চলেছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবাই কিছু না কিছু উপকার করে চলেছে, আর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক থাকায় কারও বংশ ভয়ানকভাবে বেড়ে যেতে পারছে না।

প্রথমে জীবজগতের কথা ধরা যাক। কৃষক জমি চাষ করে। তার জমির মাটিকে আলগা করে কেঁচো। মাটিতে বসবাসকারী অতি ক্ষুদ্র কয়েক জাতের ব্যাকটিরিয়া আকাশ থেকে নেমে আসা

নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের খাদ্যে রূপান্তরিত করে। জীবজন্তুরা মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। তাদের মলমূত্র জমিতে পড়ে এবং জমি হয় উর্বর। তাইতো বছরের পর বছর ফসল তোলে কৃষক।

কেঁচো ও ব্যাকটিরিয়াদের শত্রু আছে। ফসলের ক্ষতিকারক ইঁদুরের শত্রু পেঁচা, বনবেড়াল, সাপ ইত্যাদি। পোকামাকড়ের উপদ্রব নষ্ট করে শালিক, ফিঙে, বুলবুল, চড়ুই প্রভৃতি পাখীরা। কে না দেখেছে, সবুজ ধানক্ষেতের উপর দিয়ে দলে দলে ফিঙেকে ভেসে বেড়াতে এবং শালিকদের কিচিরমিচির করতে? ওদের ক্ষিদে বড় ভয়ানক। প্রচুর পোকামাকড়কে সাফ করে বলেই কৃষকের সোনার ফসল রক্ষা পায়।

পাখীদের বংশও বাড়তে পারছে না। তাদের সংহার করছে বাজ, খেঁকশিয়াল, খাটাস, সাপ, পেঁচা প্রভৃতি কত কি! আবার পরবর্তীদের বংশও বাড়তে পারছে না। একে অপরের বাচ্চা চুরি করে খায়। সাপের বংশ ধ্বংস করে গোসাপ, দাঁড়াস, বেজি প্রভৃতি। এমনকি সোনা ব্যাঙরাও সাপের বাচ্চা ধরে ধরে খায়। সাগরে মাছের শত্রু তিমি, তিমির শত্রু তিমিঙ্গিল, এও যেন তেমনই। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে একটা সাম্যভাব বিরাজমান।

সাম্যভাব অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের চার-পাশে আবর্জনার পাহাড় জমে উঠে, কত নোংরা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলি, সেগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। কিছু কিছু গাছের ফলের বেলায়ও তাই হয়। প্রকৃতি যদি নিজে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা না করতো তাহলে পৃথিবীটা পরিণত হতো একটা নরককুণ্ডে। কাক, চিল, শেয়াল, শকুন প্রভৃতি আমাদের পরিবেশের এক-একজন বন্ধু। শালিক, ছাতার প্রভৃতি পাখী আবর্জনার ভেতরে যে-সব ক্ষতিকারক পোকামাকড় ডিম পাড়ে তাদের খেয়ে সাফ করে দেয়। অপরদিকে পোকামাকড় এবং ব্যাকটিরিয়াদের দ্বারা মাটির অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিউমাস গঠিত হয়। অথচ পোকামাকড়দের বংশও বাড়তে পারছে না পাখীদের জন্য।

তৃণভোজীরা তৃণ খেয়ে জীবন ধারণ করে। মাংসাশীরা বেঁচে থাকে

তৃণভোজীদের মাংস খেয়ে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে প্রোটিন গ্রহণ করি মাছ, তৃণভোজী ও পাখীদের মাংস থেকে। আপাতদৃষ্টিতে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীদের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মনে হয় এরা যেন প্রকৃতির অবাঞ্ছিত সৃষ্টি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে প্রকৃতির অবাঞ্ছিত কেউ নয়। ওরা না থাকলে তৃণভোজীদের সংখ্যা অনিবার্যভাবে বেড়ে যেতো—খাদ্যের হতো ঘাটতি। তৃণভূমি, বনের ছোট ছোট ঝোপঝাড়, কিচ্ছুটি থাকতো না। অথচ বনই হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আর ঐ বনের রক্ষক এবং সজাগ প্রহরী হচ্ছে বাঘ সিংহরা। ওদের ভয়ে তৃণভোজীরা অধিক ভোজনের সুযোগ পায় না, অমিতব্যয়ী হতে পারে না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্টও করতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আহার করতে হয়, নাক ও কানকে সজাগ রাখতে হয়, সামান্য আহারের পর নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে হয়। তাইতো বজায় থাকে বনের শোভা, তার গম্ভীর পরিবেশ—প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদ।

বন যে সবচেয়ে বড় সম্পদ—সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। বন না থাকলে পৃথিবীর বুকটা একটা উষর মরুক্ষেত্রে পরিণত হতো। হিসেব করে দেখা গেছে, সুবৃষ্টি এবং জীব জগতের পরিবেশটাকে শুদ্ধ তথা পবিত্র রাখতে যে কোন দেশের মোট আয়তনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ বন থাকা দরকার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমাদের ভারতভূমির কথা ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে একশ কিংবা দেড়শ বছর আগেও এই পরিমাণই অরণ্য সম্পদ ছিল। আজ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছ'ভাগের একভাগ মাত্র।

মানুষ আজ যেন ভাইরাসের মত বংশবিস্তার করে চলেছে। তাই ওদের দ্বারা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বহুল পরিমাণে। অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্র বানাচ্ছে, বনের সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে বাঘ-সিংহকে, মাংসের লোভে অপ্রয়োজন সত্ত্বেও নৃশংসভাবে সংহার করে চলেছে মৃগকুলকে।

লোকালয়ের বন্ধু পশুপাখীদের হত্যা করতেও মানুষ কুণ্ঠাবোধ

করছে না। এদিকে শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ যেভাবে বাড়িয়েছে তাতে পোকামাকড়দের সংখ্যা অনিবার্য কারণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না। তাই দিনের পর দিন কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছে কীটনাশক ওষুধ। মাছ-কাঁকড়া মরছে, আর সেই মরা মাছ-কাঁকড়া খেয়ে মরছে চিল প্রভৃতি পাখী এবং শেয়াল প্রভৃতি কত পশু। পোড়ো জমি, বড় বড় গাছ না থাকায় তাদের নিরাপত্তা নেই। তাই নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে তারা। পল্লীবাংলার গাছের মগডালগুলিতে এখন আর চিলদের তেমন বাসা বাঁধতে দেখা যায় না, ঠিক দুপুরে ভেসে আসে না তাদের কাতর স্বর, পুকুরঘাটে নতুন বউদের হাত থেকে ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে পালায় না, মাঠে জেলেদেরও বিরক্ত করায় না। আর আগের মত রাত্রির প্রহরও ঘোষণা করে না শেয়ালরা।

বাংলার বুক থেকে হারিয়ে গেছে কত পশু-পাখী। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সজারুরা। একমাত্র চিড়িয়াখানা ছাড়া ওদের দেখা যায় না। নিশ্চিহ্নের মুখে খরগোশরা। বাঁশ থেকে কৃষকেরা ভাল রোজগার করেন বলে তাঁরা কিছু বাঁশঝাড় আজও টিকিয়ে রেখেছেন। সেইখানেই বাসা বেঁধে থাকে কিছু কিছু খরগোশ, খাটাস, ভোঁদড় প্রভৃতি। ওদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি কেউ প্রদর্শন করে না। একটা খরগোশের জন্য ফাঁদ পেতে সারাদিন রাত তীর্থের কাকের মত বসে থাকে মানুষ। গৃহ-পালিত হাঁস মুরগী কিংবা পুকুরের মাছ ও বাগানের দু-চারটে কলা-বেগুন নষ্ট করে বলে উদ্-মাউল, খাটাস ইত্যাদিকে বিষ দিয়ে অথবা বন্দুক উঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সাগর তীরে কিংবা ঝিলের ধারে একটি যাযাবর কোন পাখীকে দেখলে দশ গাঁয়ের দশটা বন্দুক ছুটে আসে।

আগে মাঠে মোটা মোটা আল ছিল, সরকারি বাঁধ ছিল, পোড়ো জায়গাও অনেক ছিল। বাবলা, কুল, বৈঁচি, নিম, সোঁদাল, খেজুর, তাল, শিরীষ প্রভৃতি কত গাছ হতো। শিরীষের মাথা ছেয়ে যেতো লাল ঝুমকায়, মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হতো ঝাড় ঝাড় সোঁদাল ফুল, ফলে ফলে কালো হয়ে থাকতো বৈঁচির ঝোপ, দোল খেতো জানা অজানা কত পাখী। এখন যেন স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

মাঠে বড় বড় গাছ থাকতো বলে কোটরে কোটরে বাসা বাঁধতো কত পাখী, কত ছোট ছোট জীবজন্তু। তলায় গর্তে থাকতো খেঁকশিয়ালরা। একটু আঁধার হলে ছায়া ছায়া ঝোপগুলি মাথায় জোনাকির লক্ষ মানিকের মুকুট পরতো, গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতো খেঁকশিয়াল। খ্যাক খ্যাক করে ছুটে বেড়াতো, মুখে নীলাভ আলোর দ্যুতি লক্ষ অশরীরীর নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মত মনে হতো, ভুস্ ভুস্ করে ডাকতো খাটাস, ছেলে বুড়ো সবার মনে জাগতো রোমাঞ্চ।

আজ আর মাঠে মাঠে মোটা আল নেই, পোড়ো জমিও নেই। কৃষকরা জমির সীমা বাড়াতে বাড়াতে সরকারি বাঁধগুলোও সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে। কিছু কিছু চওড়া রাস্তা পাকা হয়েছে। গাছও আছে কিছু কিছু। কিন্তু রাতদিন বাস, লরি ও ট্যাক্সির ভোঁ ভোঁ শব্দের মানুষেরই বিরক্তি আসে। ওরা বাসা বাঁধবে কেমন করে?

এদিকে অর্থ রোজগারের ধান্দায়ও বেশ কিছু কিছু প্রাণী নিঃশেষ হতে চলেছে। সভ্যতার সৌখিন উপকরণ সংগ্রহ করতে বছরে লক্ষ লক্ষ দাঁড়াশ, গোসাপ প্রাণ বলি দিচ্ছে। অথচ ওরা নির্বিষ এবং মানুষের বন্ধু। ওরা দুজনেই বিষধর সাপের বাচ্চাকে ভক্ষণ করে। দাঁড়াশরা আবার ইঁদুরের বংশ ধ্বংস করার জন্য গৃহস্থের যেন আত্মীয়। ওরা মানুষকে ভয় পায় না আর মানুষও ওদের ভয় করে না। সবার সামনে ওরা ঘরে ঢুকে পড়ে। চোর-তস্কর এরা নয়, ইঁদুর ও ব্যাঙ ছাড়া অন্য জিনিসে লোভও নেই। মানুষকে ওরা নিজের বলে মনে করে, অথচ মানুষ তাদের রক্ষা করে না।

আজ আষাঢ়ে নতুন বর্ষায় সোনা ব্যাঙরা তেমন আসর বসায় না। পল্লীর প্রান্তর মুখরিত হয় না তাদের গ্যাঁঙর গ্যাঁঙর ডাকে। বৈদেশিক মুদ্রার আশায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সোনা ব্যাঙ চালান যাচ্ছে বিদেশে। ওরা মাছ খেয়ে মাছের ঘাটতি ঘটাতো বটে কিন্তু বিষধরদের বাচ্চা খেয়ে উপকারটিও বড় কম করতো না। মনে হচ্ছে আজ থেকে হয়ত আর দশ বিশ বছরের মধ্যে ওরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেদিনের ছেলে মেয়েরা কবি বিদ্যাপতির সেই সুললিত "মত্ত

দাহুরি ডাকে ডাহুকী” পদটির মধ্যে বাস্তবতা খুঁজতে গবেষণায় প্রবৃত্ত হবে।

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। শুধু উল্লেখ করতে হয় যে, বাস্তবক্ষেত্রে জীবসম্প্রদায় খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে খাদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত। সর্বত্রই বিরাজিত সাম্যভাব। কারও বংশ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলার উপায় নেই, আবার নিঃশেষও কেউ হয় না। পরভোজীপ্রাণী যথা পশুর গায়ে এঁটেলি, জোঁক ইত্যাদিও পারছে না। পতঙ্গভুক পাখীরা তাদের সংহার করে। পশুর সঙ্গে পাখীর তাই একটা সহ অবস্থানের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পাখীরা পশুদের গায়ের এঁটেলি পরিষ্কার করে খায় আর কত আরামে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে গবাদি পশুরা। দুর্দান্ত কুমীরের দাঁতের গোড়া থেকে জোঁক বার করে খায় কুমীর পাখী। বনের পাখীরা আবার কাছাকাছি হিংস্র জন্তুদের উপস্থিতি টের পেলে চিৎকার করে সাবধান করে দেয় তৃণভোজীদের।

কেবল জীবনে নয় জীবের মৃত্যুও প্রকৃতির সাম্য রক্ষা করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী জীব মাত্রকেই মৃত্যু বরণ করতে হয়। মৃত্যু পুরাতনের বিদায় এবং নতুনের আধিপত্য ঘোষণা করে। মৃত্যু আছে বলে জীবনটা এত সুন্দর ও এত মোহময়। মৃত্যু আছে বলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। অমর হলে অনেক আগেই পৃথিবীটা একটা জঞ্জালস্তূপে পরিণত হতো কিংবা পূতি গন্ধময় এক নরকে।

মৃত্যু জীবের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করছে। মৃতজীবী যারা তারা বেঁচে থাকছে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ খেয়ে। সবটা নিঃশেষ করতে পারছে না। যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বিয়োজিত করে জীবাণু ও ছত্রাকরা। উৎপন্ন হয় কতকগুলি সরল জৈব ও অজৈব যৌগ। যাদের কিছু কিছু মাটিতে থেকে যায় আর বাকিটা ফিরে যায় বায়ুমণ্ডলে।

যেগুলি মাটিতে থেকে যায় সেগুলি পচাপাতা ইত্যাদির সঙ্গে ক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন করে মাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হিউমাস। এই হিউমাস

হচ্ছে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রধান উপাদান। প্রচুর ফসল ফলার মূলেই এই হিউমাস।

যারা আকাশে যায়, তাদের কিছু কিছু আবার বারিধারার সঙ্গে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। সঞ্চিত হয় পুষ্করিণী, হ্রদ, সাগর প্রভৃতির বুকে। এখানেও চক্রক্রম বজায় থাকে কিনা কে জানে? কে জানে এককোষী প্রাণী, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে আকাশ থেকে নেমে আসা জৈব যৌগ থেকে জন্মগ্রহণ করে কিনা? কেননা, আদিম উত্তপ্ত পৃথিবীর উর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্তর গঠিত না হওয়ায় ছুটে আসতো সূর্যের অতিবেগুনী, অবলোহিত প্রভৃতি ক্ষতিকর রশ্মিগুলি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতি তপ্ত পরিবেশে ঐ সব ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলেই সংশ্লেষিত হয়েছিল জৈব যৌগ। তার পরে যখন বৃষ্টিস্নাত হল ধরা, তখনই ওরা বৃষ্টিধারার সঙ্গে নেমে এসেছিল এবং জলে প্রথম সৃষ্টি করেছিল প্রাণ। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় আদিম এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী এবং শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের শেষ ধাপে আজকের উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ। বর্তমানে উর্ধ্বাকাশে সুদৃঢ় ওজোনের স্তর গঠিত হওয়ায় সূর্যের একমাত্র আলোক রশ্মি, বেতার রশ্মির কিয়দংশ এবং যৎসামান্য অতি বেগুনী রশ্মি ছাড়া অন্যান্য রশ্মি প্রবেশ করতে পারছে না বলে বায়ুমণ্ডলে জৈব যৌগের সংশ্লেষণের সমূহ সম্ভাবনাকে একেবারে পরিত্যাগ করা যায় না। হয়ত চক্রপথে ঘুরছে জীবের জন্ম-মৃত্যু। হয়ত জীবের দেহা-বশেষের কিছু যাচ্ছে বায়ুতে, বায়ু থেকে আসছে জলে, জলে জন্মগ্রহণ করছে এককোষী প্রাণী। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় এক-কোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের ও মেরুদণ্ডীদের উদ্ভব কল্পনা করতে দোষ কি?

এবার জীবের সঙ্গে উদ্ভিদের নিবিড় সম্পর্কের কথায় আসা যাক। জীব নিঃশ্বাসের সঙ্গে সবসময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ত্যাগ করছে তাকে গ্রহণ করছে উদ্ভিদজগৎ এবং সূর্যকিরণের সাহায্যে তাকে পাতায় বিশ্লিষ্ট করছে। খাদ্য তৈরির কাজে প্রয়োগ করছে কার্বনকে এবং বাতাসকে

উপহার দিচ্ছে অক্সিজেন। তাই বাতাসে অক্সিজেনের সমতা রক্ষিত হচ্ছে। সম্ভব হয়েছে জীবের জীবন ধারণের। অপরপক্ষে জীবের দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড না হলেও চলছে না উদ্ভিদের। এখানেও সাম্য।

মানুষ বুদ্ধিবলে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সূর্যালোকের মত এত অল্প উত্তাপকে নিয়ে ক্লোরোফিলের সাহায্যে উদ্ভিদ কেমন করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন নিয়ে আপন খাদ্য আপনিই উৎপন্ন করে সে তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি। পারলে হয়ত নিজেরই পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডটাকে কাজে লাগাতে পারতো। অতএব যতদিন না পারছে ততদিন, কিংবা চিরকালই তাকে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হবে।

কতরূপে উদ্ভিদকে ব্যবহার করছি আমরা! খাদ্যরূপে-ওষুধরূপে গ্রহণ করছি, আসবাবপত্র নির্মাণ করছি, জ্বালানী হিসাবে এন্তার পোড়াচ্ছি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরাই আমাদের একমাত্র সহচর। অতীতের উদ্ভিদদেহ ভূগর্ভে সঞ্চিত হওয়ার ফলে আমাদের সভ্যতার এত বাড়বাড়ন্তও।

আর উদ্ভিদ! তারও চলছে না আমাদের ছাড়া। কার্বন ডাই-অক্সাইড তো বটেই, মৃত ও গলিত জীবজন্তুর দেহাবশেষ-মলমূত্র ইত্যাদি ব্যাক্‌টিরিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গঠন করছে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান। তার দেহে বসবাসকারী ক্ষতিকারক কীট, পতঙ্গ ও ছত্রাকদের ধ্বংস করছে পাখীরা। পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে তাদের বংশরক্ষার সাহায্য করছে। বীজকে দূর-দূরান্তরে বহন করে বংশবিস্তারেরও সুযোগ করে দিচ্ছে।

পরস্পর নির্ভরশীল জীব ও উদ্ভিদজগৎ—যার একজনের অনুপস্থিতিতে অপরে টিকতে পারে না। ওরা মূক, চলাফেরাও করতে পারে না। ইতর জীবজন্তু বুঝে না উদ্ভিদের মাহাত্ম্য। তারা প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র। মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠ জীব, তার জীবন কোথায় কোথায় বাঁধা আছে—সে ভালভাবেই জেনে নিয়েছে। তাই তার নিজের স্বার্থে তাকে এগিয়ে আসতে হবে। যে সব বন এখনও টিকে আছে তাদের ধ্বংস

না করে যত্ন নিতে হবে, নতুন নতুন বন সৃষ্টি করতে হবে, অব্যবহার্য জায়গায় রোপন করতে হবে উদ্ভিদকে। সবাইকে যত্ন নিতে হবে এবং অপত্য নির্বিশেষে প্রতিপালন করতে হবে।

বড় বড় গাছ যেখানে যতটুকু আছে তাকে কেটে নিঃশেষ করা উচিত হবে না। সমসংখ্যক রোপিত গাছ বড় না হলে পুরানো গাছ কাটা নিজেদেরই হত্যার সামিল। মনে রাখতে হবে একটা বড় গাছ যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শুদ্ধ করতে পারে, ছোট গাছ ততখানি পারে না। তদুপরি বড় গাছই আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা রাখতে পারে, আকাশের জলদ মেঘকে আকর্ষণ করতে পারে, বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বেশী জলীয় বাষ্প বাতাসে ছড়াতে পারে।

দেখা গেছে, শিল্পাঞ্চলে এবং রাজপথের দু'পাশে বড় বড় গাছগুলো প্রায় মরতে বসেছে। তাদের পাতার কোন সুষমা নেই। গুঁড়িটা খাড়া আছে আর বিরল পত্রযুক্ত কতকগুলি শাখা। ওদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কলকারখানা এবং যানবাহন। সাধারণত বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ তার পাতার তলদেশেই খাদ্য প্রস্তুত করে। অথচ উপরোক্ত জায়গাগুলিতে পাতার তলায় ধোঁয়া ও ধুলোর আস্তরণ পড়ে যায়। তাই ব্যাহত হয় ওদের খাদ্য তৈরি করা। দিনে দিনে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে উঠে। ক্ষতিকারক ছত্রাকরা এসে বাকলে বাসা বাঁধে এবং ওরা তখন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

জীব ও উদ্ভিদের এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সর্বত্র যে সাম্যভাবের দৃষ্টান্ত, এগুলি বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই শাখাটিকে বলা হয় ইকোলজি বা বাস্তব বিদ্যা।

ইকোলজি শব্দটি প্রথম জার্মান বিজ্ঞানী হেক্‌ল গ্রীক ইকোস শব্দটি থেকে চয়ন করেন। ইকোস শব্দটির অর্থ বাসা এবং বিস্তৃত অর্থ বাস্তু পরিবেশ। তাই ইকোলজিকে বাস্তু সংস্থানও বলা হয়।

বিজ্ঞান দেখিয়েছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, জলমণ্ডলে, মাটি এবং পাথরের স্তরে বা অশ্মমণ্ডলে নানা জাতীয় যে সব জীব বাস করে তাদের কেউই স্ব-নির্ভর নয়। এই মণ্ডলগুলির যেখানে যেখানে জীবের বেঁচে

থাকার পরিবেশ আছে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদের বলা হয় জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার। দেখা গেছে, জীবমণ্ডলের সমস্ত জীব, জলমণ্ডলের জল, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস, অশ্মমণ্ডলের মাটি ও নানা খনিজ পদার্থ, সবার মধ্যে আছে একটা নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বাস্তব্যমণ্ডল বা ইকোস্ফিয়ার নামে খ্যাত।

বাস্তব্যমণ্ডলের সবকিছু মিলে যেন একটা যৌথ পরিবার, অর্থাৎ বিশ্বের জল, বায়ু, মাটি, জীবজন্তু, উদ্ভিদ সবকিছুই মাত্র একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকেরই এক একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। অথচ ভুল করছে একা মানুষ। তার স্পৃহা প্রকৃতিকে জয় করা। উক্ত মনোভাব যে অতীব বিপজ্জনক সেকথা ১৮৭৪ সালে প্রথম এঙ্গেলসই মনে হয় উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন "আমাদের রক্ত, মাংস ও মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা প্রকৃতিরই অঙ্গ, প্রকৃতির মধ্যেই অস্তিত্ব। প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব বলতে শুধু এইটুকুই বোঝায়—যাতে আমরা প্রকৃতির নিয়মগুলোকে শিখে নিতে পারি এবং সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারি।

বাস্তব্যমণ্ডলের কোন কিছুর সমতা যদি কোন কারণে বিঘ্নিত হয় তাহলে বিপর্যয় আসবেই। যেমন বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন যদি কমে যায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, ঊর্ধ্বাকাশে ওজোনের স্তর যদি বিনষ্ট হয়, উদ্ভিদের বংশ যদি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, মাটি যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহলে বাস্তব পরিবেশ কিছুতেই থাকবে না। সৃষ্টি হবে নতুন পরিবেশ এবং ঐ নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উদ্ভব হবে নতুন জীব ও উদ্ভিদের।

এ কথাও সত্য যে, প্রকৃতি নিজে সবসময় একটা সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে। একটি অবস্থার সামান্য রদবদল হলে কিংবা কিছুটা অবনতি ঘটলে অপরাপর অবস্থার তারতম্যের মাধ্যমে সমতা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পরিবর্তন যদি খুব বড় রকমের হয় তাহলে সমতা কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না। যেমন অতীতের নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের

ফলে বার বার বিঘ্নিত হয়েছে পরিবেশ এবং নতুন পরিবেশে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন জীব ও উদ্ভিদ।

অতএব বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে,

বিশাল বিশ্বের মাঝে
যদি জাগে সামান্য স্পন্দন,
যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ হোক
মুক্ত নহে, মুক্ত নহে জীবের জীবন।

পরিবেশ এবং জীব ও উদ্ভিদের উপর পরিবেশের প্রভাব ঃ

"পৃথিবীর" মাটি, "পৃথিবীর" জল,
"পৃথিবীর" হাওয়া, "পৃথিবীর" ফল,
ধন্য হউক, ধন্য হউক, ...

মহাকাশে অনুসন্ধান চালিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ যত খবর সংগ্রহ করেছে তাতে দেখা গেছে একমাত্র আমাদের জননী ধরিত্রীই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। এমন মাটি, এমন জল, এমন আবহমণ্ডল, এমন বিচিত্র জীব ও উদ্ভিদ জগৎ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশ্ব-ভুবন মাঝে তাই আমাদের জননীর কোন তুলনা নেই।

পৃথিবী, তার অঙ্গের শ্যামল রূপটার জন্যই সে অপরূপা। আবার তার সেই শ্যামল রূপের মূলে আছে মাটি, জল, হাওয়া ও সূর্যকিরণ। আকাশ, বাতাস, সূর্য, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশী। আর আমাদের পরিবেশ সম্মিলিত আকাশ, বাতাস, সূর্যালোক, মাটি, জল, উদ্ভিদ ও প্রাণী। উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর প্রতিবেশীও বটে।

প রিবেশ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁরা আমাদের পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। ভৌত পরিবেশ ও জৈব পরিবেশ। জল, মাটি, বায়ু ও বায়ুমণ্ডলের চাপ, সূর্যালোক, উষ্ণতা ইত্যাদি অবস্থাগুলিকে ভৌত পরিবেশ বলা হয়। অপরপক্ষে জীব ও উদ্ভিদ—যারা একে অপরের উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরস্পর নির্ভরশীল সেই পরিবেশটাই জৈব পরিবেশ।

আমরা যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করি এবং বড় হই, সেখানকার জল, হাওয়া, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু এমনকি চারপাশের লোকজন সবাইকে আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া মানুষের উপর তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশও কম গুরুত্ব-

পূর্ণ নয়। অস্বাস্থ্যকর সামাজিক, রাজনৈতিক ও গৃহ পরিবেশ মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়।

[সামাজিক পরিবেশের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে]

জীব ও উদ্ভিদের ভৌত পরিবেশকে "বসতি"ও বলা হয়। এই বসতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন। কোথায় অতলান্ত মহাসমুদ্র, কোথায় সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। কোথায় চিরতুষারাবৃত মেরু অঞ্চল আবার কোথাও মরুভূমির ধু ধু বালুরাশি। কোথাও তীব্র দাবদাহ আবার কোথাও প্রচণ্ড শীত। অথচ সব জায়গায় অল্পবিস্তর জীব বাস করে এবং এইসব অঞ্চলের প্রত্যেকটিই বসতি। কিন্তু দেখা গেছে, এক বসতির জীব অন্য বসতিতে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। যেমন মিঠা জলের বাসিন্দারা টিকতে পারে না লোনা জলে, জলের জীব ডাঙায় এলে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়। ডাঙার জীব জলে থাকতে পারে না, পারে না মেরুদেশের জীব ও উদ্ভিদ নিরক্ষ অঞ্চলে টিকে থাকতে।

জীবদের নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে স্থলভাগের ও জলভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী বাসিন্দারা পৃথক পৃথক। পরিবেশ অনুযায়ী দেহে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্যই গভীর সমুদ্রে যারা বাস করে তারা নদীর মোহানা অঞ্চলে বা অগভীর অঞ্চলে থাকতে পারে না। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে যাদের বসতি তারা কিছুতেই নিরক্ষ অঞ্চলে অথবা সাগরতীরে বাস করতে পারে না। অতএব ভিন্ন ভিন্ন বসতিতে জীব ও উদ্ভিদ থাকে নির্দিষ্ট। তার কারণ, ভৌত পরিবেশ মাত্রই জীব ও উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলির তারতম্যে জীব ও উদ্ভিদ দেহ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়।

দু একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠবে। প্রথমে জলচর জীব ও উদ্ভিদদের কথা ধরা যাক। উদ্ভিদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, স্থলভাগের উদ্ভিদদের থাকে হরেকরকমের সমস্যা। তাই ওদের দৈহিক গঠন বেশ কিছুটা জটিল। কিন্তু জলে যারা জন্মায় তাদের গঠন অনেকটা সরল। ওদের কাণ্ড সংক্ষিপ্ত ও স্পঞ্জের মত

নরম। প্রত্যেকের কাণ্ডে থাকে অসংখ্য বায়ুগহ্বর। তাই জলে ভেসে থাকতে সুবিধা হয় ওদের।

কোন কোন জলজ উদ্ভিদের পাতাগুলো জলের উপরে ভাসতে থাকে, কারও কারও পাতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জলমগ্ন থাকে। যাদের পাতা জলের উপরে থাকে তাদের পাতা সাধারণত বড় ও গোল গোল। তারা বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে সূর্যালোকের সাহায্যে, মূলদ্বারা শোষিত রসকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুত করে খাদ্য। অক্সিজেনও গ্রহণ করে বাহির থেকে। নিমজ্জিতরা সবকিছুই সংগ্রহ করে পরিবেশের জল থেকে।

অধিকাংশ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের পাতা সরু সরু। প্রধান মূল থাকে না কারও। আর থাকে না মূলরোম। জলীয় পরিবেশে থাকার জন্যই তাদের মূল্যের এই বৈশিষ্ট্য। অগভীর সমুদ্রে লবণাক্ত জলের পরিবেশে যেসব শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় তাদের অধিকাংশের নিচের দিকটা মূলের মত গঠন হলেও ঠিক ঠিক মূল নেই কারও। মূলের মত জিনিসটি তলায় মাটি কিংবা পাথরের গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকায় উপাদান বিশেষ। সমুদ্রে আবার প্রচুর অজৈব লবণের ছড়াছড়ি। তাই সাগর উদ্ভিদদের কোষে কোষে সঞ্চিত থাকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ।

জলচর জীবদের দৈহিক গঠনও স্থলচর জীব অপেক্ষা অনেক সরল। জলে বাস করে বলে ওদের সমস্যাও অনেক কম। জলে চলাফেরা করতে হয় বলে হাত পা কারও নেই। অনেকটা নৌকার মত দেহের গঠন। অর্থাৎ মাঝখানটা মোটা, সামনের ও পেছনের দিকটা ক্রমশঃ সরু। জল কেটে এগুতে হয় তাই পুচ্ছ ও পাখনা। অনেকের পেটের মধ্যে থাকে বায়ুপূর্ণ থলি বা পটকা। বিশেষ গভীরভাবে চলাফেরা করা এবং স্থির হয়ে ভেসে থাকার হাতিয়ার বিশেষ।

জলে ডুবে থাকতে হয় বলে জলচর জীবরা পর্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ করতে পারে না। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকেই তাদের গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই থাকে ফুলকা। ত্বকের ভেতর দিয়ে

দেহে যাতে জল প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আঁশ থাকে। যাদের আঁশ নেই তাদের চামড়ার মিউকাস গ্রন্থি থেকে নির্গত মিউকাস দেহটাকে বর্মের মত ঘিরে রাখে। ঐ মিউকাস ক্ষতিকর ছত্রাক কিংবা জীবাণুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে জলচরদের।

তিমি, শুশুক, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতিরা নাকি এককালে ডাঙার বাসিন্দা ছিল। তার আগে ওদের পূর্বপুরুষ জল থেকে উঠে এসেছিল ডাঙায়। ডাঙায় খাদ্যের অভাব দেখে ওরা পুনরায় যখন জলে নেমে যায় তখন বিবর্তনের ধারায় জলে বাস করার সমূহ বৈশিষ্ট্য লুপ্ত না হলেও অনেক বৈশিষ্ট্য লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল। তবে জলে বাস করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ওরা প্রত্যেকে স্তন্যপায়ী এবং সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতিরা এখনও মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে আসে।

ওদের প্রত্যেকের পাখনা অবশ্য আছে। তবে ওদের পাখনাকে ঠিক ঠিক পাখনা বলা যায় না। তিমির সামনের এবং সীল-সিন্ধুঘোটকের পেছনের পায়ের আঙ্গুলগুলো চামড়া দিয়ে জোড়া। অনেকটা হাঁসদের পায়ের মত। পেঙ্গুইন নামের পাখীরা, যারা অধিকাংশ সময় জলে থাকে তাদের পায়ের গঠনও অনুরূপ। তাই পা দিয়ে জল টেনে ওদের অগ্রসর হতে কোন অসুবিধা হয় না।

তিমিদের মাথার উপরের দিকে একটি অথবা দুটি নাসারন্ধ্র থাকে। ইচ্ছামত জলের উপরে ভেসে উঠে ফুসফুসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে আর প্রয়োজন শেষে নাসারন্ধ্র আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ওদের ফুসফুসের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা আবার অনেক বেশী। উক্ত কারণে একবার বায়ু গ্রহণ করলেই দীর্ঘক্ষণ জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে। জলে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে বেশী লোম অসুবিধাজনক বলে লোম বড় একটা কারুর থাকে না। সিন্ধুঘোটকের যদিও লোম থাকে তাহলেও খুব পাতলা, তিমিদের লোম না থাকার মতই।

স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ যথেষ্ট ঠাণ্ডা। তাই জলচরদের দেহে তাপ সংরক্ষণেরও বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কারও চামড়ার তলায় থাকে পুরু মেদের স্তর, কারও ঘন সন্নিবিষ্ট একগুচ্ছ ধমনী ও শিরা।

এদের বলা হয় রেটি মিরাবাইল। এখানে থাকে উষ্ণ রক্ত। ভিন্ন ভিন্ন শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার আগে রেটি মিরাবাইল অঞ্চলে আসে এবং উষ্ণ রক্তের সংস্পর্শে তাপ গ্রহণ করে।

সাগর জলে ছোট বড় হরেক রকমের জীবজন্তুর বাস। বড়রা ছোটদের ধরে ধরে খায়। উক্ত কারণে রাক্ষুসে পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিহীনদের দেহে গড়ে উঠেছে হরেকরকমের ব্যবস্থা। কেউ স্বচ্ছ, কেউ সবুজ রঙের। স্বচ্ছরা হঠাৎ চোখে পড়ে না আর সবুজরা দিব্যি শেওলার ভেতরে আত্মগোপন করে থাকে। সাগর কুসুমদের হাঁটার ক্ষমতা নেই। কিন্তু দেহে থাকে বিষাক্ত কর্ষিকা। ভয়ে কেউ এগোয় না তাদের কাছে। কাছে পিঠে খাদ্য দেখলে ঐ কর্ষিকা বিস্তার করেই ধরে ফেলে।

এবার মরুবাসীদের পরিবেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মরু-ভূমির পরিবেশ অন্যান্য পরিবেশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম এবং রাতে হাড়-কাঁপানো শীত। জল নেই, বৃষ্টি-পাত কালেভদ্রে হয়। চারদিকে কেবল ধু ধু বালুরাশি। একেবারেই রুক্ষ পরিবেশ। তাছাড়া দিনের বেলায় প্রায়ই ওঠে বালির ঝড়। মাঝে মাঝে মরুদ্যানগুলিতে অল্পস্বল্প ঝোপ ঝাড়, কাঁটা গাছ ও খেজুর গাছ দেখা যায়।

মরুভূমির অতি তপ্ত পবিবেশে জীবজন্তুর থাকার কথা নয়। তবুও সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অবস্থান করে বেশ কয়েক প্রকারের জীব।

মরুভূমির সবচেয়ে বড় সমস্যা জলের সমস্যা। জল ছাড়া জীব ও উদ্ভিদের একদণ্ডও চলতে পারে না। অথচ সেখানকার জীব ও উদ্ভিদদের কিছু কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দিব্যি টিকে আছে। প্রথমে আসা যাক উটের কথায়। মরুভূমির জাহাজ ওরাই।

আমরা জানি, অধিকক্ষণ জলপান না করলে রক্তে জলের পরিমাণ কমে যায়। এই অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে এবং মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু উটদের জলপান না করেও অনেকদিন চলে

যায়। ওদের রক্তের তারল্য বজায় রাখবার জন্য দেহের কলারস থেকে আপনিই নির্গত হয় জল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে চলতে থাকে। তাতে কোন অসুবিধা হয় না উটের। কেবলমাত্র রোগা হয়ে যায় এবং ওজনও কিছুটা কমে যায়। অথচ ওদের দেহের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, জলপানের কয়েক ঘণ্টার পরেই দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। ঘামও ঝরে না ওদের দেহ থেকে।

কেবল উট নয়, অন্যান্য এমন বহু মরুচারী আছে—যাদের বছরের পর বছর জল পান না করলেও কোন অসুবিধা বোধ হয় না। এক রকম শামুক কেবল বৃষ্টি হলেই জলপান করে। বছরের পর বছর বৃষ্টি হয় না মরুভূমিতে। আর ওরাও দিব্যি কাটিয়ে দেয় জলপান না করেই। তাদের দেহের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, পরিবেশের সহজলভ্য খাদ্য থেকেই জলের অভাবটা মিটিয়ে ফেলে।

গিরগিটি জাতীয় কিছু জীব মরুভূমিতে বাস করে। তাদের ত্বকের এমনই গঠন যে, মরুভূমির বায়ু থেকেই জলীয় বাষ্পকে শোষণ করে নিতে পারে। ঠিক যেন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা কেলাস-জলমুক্ত কপার সালফেটের মত।

মরুভূমিতে বাস করারও সমস্যা আছে। দিনের বেলায় উত্তপ্ত পরিবেশে অধিকাংশ জীবজন্তু গর্তে কিংবা ঝোপের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। রাত্রে ঠাণ্ডা পরিবেশে বেরিয়ে আসে গর্ত ছেড়ে। অন্যান্য পরিবেশের জীবদের মত মরুভূমির জীবদের দেহের চামড়ার তলায় সর্বত্র মেদের আস্তরণ থাকে না। সর্বত্র মেদের স্তর থাকলে তাপ বিকিরণের খুবই অসুবিধা। যেহেতু মরুভূমির আবহাওয়া চরম। আবার শরীরে মেদের স্তর না থাকলেও চলে না। তাই মরুভূমির জীবদের দেহের বিশেষ এক একটি জায়গায় মেদ থাকে। যেমন উটের মেদ থাকে কুঁজে।

দেহের সর্বত্র মেদ না থাকায় দিনেরাতে মরুভূমির তাপমাত্রার বিরাট তারতম্যের ফলে মরুবাসীদের কোন অসুবিধা হয় না। দিনের বেলায় অতি তপ্ত পরিবেশে দেহ তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রির শীতল পরিবেশে

বিকিরিত হয়ে যায় সে তাপ। ঠিক যেন পৃথিবীর মাটি ও হাওয়া। উক্ত কারণে মরুবাসীদের দিনের প্রচণ্ড গরমে এবং রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় আদৌ অসুবিধা হয় না।

মরুভূমি যেহেতু একেবারে ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর থেকে কোন কিছুর উপস্থিতি বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। কিন্তু সেখানেও রয়েছে খাদ্য ও খাদক। আত্মরক্ষার উপাদান হিসাবে মরুচারী জীবদের প্রত্যেকেরই দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও ঘ্রাণ শক্তি অতি প্রখর। ভয়ানক দ্রুতগামীও তারা। মরুভূমির বালুরাশির উপর দিয়ে ছুটতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রত্যেকের পায়ের তলায় আছে মাংসের নরম গদি।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে আবার বালিঝড় উঠে। সে ঝড় আবার অতি ভয়ঙ্কর। গরম হাওয়ায় এবং বালির ঘূর্ণিতে চোখ, নাক ও কান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই ঝড় থেকে আত্মরক্ষার উপাদানও সেখানকার প্রাণীদের দেহে বিদ্যমান। চোখ ও কানের লোমগুলো বেশ বড় বড় এবং কারও কারও নাকের ঢাকনা থাকে।

মরুভূমির জাহাজ উটের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। ওদের ঘাড় বেশ লম্বা এবং চোখ দুটো মাথার অনুপাতে বেশ বড়। দিনের বেলায় উত্তপ্ত ধু ধু বালুরাশির উপর দিয়ে হাঁটতে হয় এদের। বালির উপর থেকে তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে যাতে চোখ খারাপ করতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। গলা লম্বা এবং মুখটা উপরের দিকে সমান্তরাল করে হাঁটে। মাটি থেকে চোখের দূরত্বও প্রায় তিন মিটারের মত।

মরুভূমির বেশীরভাগ জীবের রঙ অনেকটা বালির রঙের মত। ওতে সহজে ওরা পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়। কারও উপস্থিতি সহজে টের পাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে তো বাঁচতে হবে! তাই ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল। র‍্যাটেল নামে এক ধরনের অতি অদ্ভুত বিষধর সাপ থাকে মরুভূমিতে। ওরা বাতাসের উষ্ণতার সামান্য তারতম্যও ধরতে পারে। চোখ বন্ধ করে শিকারের পেছনে মাইলের পর

মাইল ধাওয়া করতে পারে। মানুষের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রও হার মানে ওদের কাছে।

মরুময় পরিবেশে যে সব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের দেহেও নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার অধিকাংশ উদ্ভিদের দেহে থাকে কাঁটা। ফণী মনসা, তেশিরা মনসা, বাবলা, শেয়ালকাঁটা প্রভৃতি মরুভূমির পরিবেশে বেশী জন্মায়। মরুভূমিতে যেহেতু জল সহজলভ্য নয় তাই এখানকার উদ্ভিদরা জল সম্বন্ধে বড্ড সচেতন ও মিতব্যয়ী। দেহে সব সময় জল সংরক্ষণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর আশ্চর্য, ওরা বাষ্পমোচনও করে খুব কম। বাষ্পমোচন করা ওদের কাছে যেন বিলাসিতা।

মরুভূমির উদ্ভিদদের জলশোষণ ক্ষমতা অন্যান্য জায়গার উদ্ভিদের চেয়ে ঢের বেশী। অনেকের মূল মাটির ভেতরে অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে, কারও বা কিছুটা প্রবেশ করার পর গুচ্ছাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটু জল সংগ্রহ করার জন্য সেকি প্রচণ্ড প্রয়াস তাদের!

বাষ্পমোচন হ্রাস করার জন্য দেহের এবং পাতার গঠনই আলাদা। বেশীরভাগের কাণ্ড চ্যাপ্টা, পুরু ও সবুজ হয়ে থাকে এবং কাণ্ডটাই পাতার কাজ করে থাকে। অর্থাৎ ঐ কাণ্ডের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে। অধিকাংশের পাতা কাঁটায় পরিণত হয় অথবা পত্র কণ্টকে রূপান্তরিত হয়। ঐ কণ্টক থাকার জন্য বাষ্পমোচন খুব কম হয়।

যেসব মরু উদ্ভিদের পাতা থাকে তাদের পাতা বেশ পুরু ও মোটা। তার কারণ, পাতাতেই তারা জলকে সংরক্ষণ করে। ত্বকও বেশ পুরু। এক কথায় বলা যায়, কী জীব আর কী উদ্ভিদ সবাই জলহীন পরিবেশে জল সংগ্রহ ও খরচ সম্বন্ধে বেজায় সতর্ক।

মরুভূমির পরিবেশে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন কোন গাছ সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করে এবং ফুল ধারণ করে শুকিয়ে যায়। তারপর গাছটা বীজ সমেত গোল একটা বলের আকার প্রাপ্ত হয়ে বালুর উপর গড়াগড়ি দিতে

থাকে। যখনই সামান্য বৃষ্টি হয় তখনই গাছটা বলিতে শাখা-প্রশাখা মেলে ধরে এবং তাতে যত বীজ আছে সবই অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হয়। আর দিন কয়েকের মধ্যেই এক একটি গাছ শুকিয়ে পূর্বের আকার ধারণ করে।

সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত মৃত্তিকায়ও কিছু কিছু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কাদামাটিতে অক্সিজেন প্রবেশ করার সুযোগ নিতান্ত কম বলে কোন কোন গাছের মূল থেকে গোঁজের মত বহু শাখামূল বেরিয়ে উপরে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। শ্বাসকার্য চালাবার জন্য ঐ ছিদ্রপথে তারা অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে। সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি গাছ এই জাতীয়।

লোনা জলে ও লোনা চিটচিটে কাদায় কোন উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। এই অসুবিধার জন্য লোনা অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা সুন্দরী গাছের ফল পাকার পরও গাছে ঝুলতে থাকে। পরে সেই গাছে থাকাকালীন্ অঙ্কুরিত হলেই খসে পড়ে মাটিতে। বংশবিস্তারের এটি একটি অদ্ভুত উপায়।

লোনা পরিবেশে যে সব উদ্ভিদ জন্মায়, তাদের বাধ্য হয়ে বহু লবণকে আত্মসাৎ করতে হয়। অনেকের পাতা তাই বেশ নোনতা। লবণ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের দেহে বিদ্যমান থাকলেও অতিরিক্ত লবণ জমলে ক্ষতি করে থাকে। তাই বিশেষ এক ধরনের গ্রন্থির সাহায্যে ওরা অতিরিক্ত লবণকে পরিত্যাগও করতে পারে। যা অপর উদ্ভিদ পারে না।

স্থলভাগের অপরাপর অংশের পরিবেশও সর্বত্র সমান নয়। যেখানে যেমন পরিবেশ স্থলভাগের অপরাপর অংশের সেখানে সেই পরিবেশ অনুযায়ী কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য জীব ও উদ্ভিদদেহে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শীতপ্রধান দেশে প্রাণীদের দেহে বেশ ঘন ও বড় বড় লোম থাকে। শীত সহ্য করার ক্ষমতাও যথেষ্ট। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আনলে ওরা অস্বস্তি অনুভব করে এবং কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। তেমনই শীতে খাপ খাওয়াতে পারে না নাতিশীতোষ্ণ

অঞ্চলের জীব ও উদ্ভিদ। অপরদিকে মেরুর প্রতিকূল পরিবেশে স্তন্যপায়ী ও পাখীছাড়া কাউকে দেখা যায় না। মেরুর প্রচণ্ড শীতে তা দিয়ে ডিম ফোটানো অসম্ভব বলে প্রকৃতির খেয়ালে পেঙ্গুইনদের পায়ে থাকে ডিম রাখার থলে।

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল উদ্ভিদের অনুকূল। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে ঘন বন। তাছাড়া প্রচুর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, কাষ্ঠলতা ইত্যাদির জন্য বনের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা। এমন জায়গায় শাখাশ্রয়ী জীবেরই প্রাধান্য। অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে সৃষ্টি হয় তৃণভূমি। তৃণভূমিতে তৃণভোজীরাই বসবাস করে আর বাস করে তৃণভোজীদের উপর নির্ভরশীল মাংসাশী প্রাণীরা।

অতএব দেখা গেল, পরিবেশ এমন একটি বিশেষ অবস্থা—যাকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয় জীব ও উদ্ভিদ জীবন। একের পরিবেশ অন্যের কাছে মৃত্যুর সামিল। বিশেষ পরিবেশে অভ্যস্ত জীব কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না অপরের পরিবেশে।

পার্থিব পরিবেশে অভ্যস্ত মানুষের কথায় এবার আসা যেতে পারে। তাকে যদি চন্দ্রপৃষ্ঠে অথবা পার্থিব পরিবেশ নেই এমন কোন গ্রহ বা উপগ্রহ ছেড়ে দেওয়া যায় সে তৎক্ষণাৎ দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে বায়ু নেই, সেখানে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি সরাসরি নেমে আসছে। বায়ু না থাকায় শ্বাসকার্য চালাতে পারবে না, আর মুহূর্তে শরীরটা ফুলে ফেঁপে বেলুনের মত হয়ে যাবে এবং ধূলিকণার মত টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যাবে কোথায়! সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলিও তার কাছে মৃত্যুবাণসদৃশ।

চাঁদ কিংবা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের কথা বাদ দিয়ে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশের কথা চিন্তা করি তাহলেও হতাশ হতে হবে। উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসী যদি গ্রীণল্যাণ্ডে গিয়ে বাস করে তাহলে তার পক্ষে টিকে থাকা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। বারমাস খাপ খাওয়াতে পারবে না মেরু দেশে।

অতএব যেই পরিবেশে আমরা বাস করছি, সেই পরিবেশেই

পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আজ যদি পরিবেশটা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায় তাহলে কেমন করে খাপ খাওয়াবো আমাদের শরীরটাকে! কেননা বিশেষ পরিবেশে অভ্যস্ত হতে বিবর্তনের ধারায় দেহে প্রকাশ পেয়েছে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য পরিবেশে একেবারে অচল। চাঁদে গেলে অথবা মরুভূমিতে হাঁটতে হলে যেমন কতকগুলি কৃত্রিম ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করতে হয় তেমনই বিরুদ্ধ পরিবেশে গেলে পরিবেশকে মানাতে কৃত্রিমতাই অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু সে তো সাময়িক। সারাজীবন কিছুতেই চলতে পারে না। তাই প্রত্যেকেরই নজর দেওয়া উচিত স্ব স্ব পরিবেশের উপর। যেন এতটুকু ভারসাম্য না হারায়, কোন কিছু অবাঞ্ছিত যেন পরিবেশে প্রবেশ না করে, মূল পরিবেশ যেন দীর্ঘকাল অটুট থাকে।

পরিবেশকে এমন ব্যাপক অর্থে প্রযোগ না করে সঙ্কীর্ণ অর্থেও যদি প্রয়োগ করি তাহলেও লক্ষ্য করবো বিরুদ্ধ পরিবেশের কুফল। যে ছেলেটা চুরি করে, খোঁজ নিলে জানা যাবে—যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে সেই পরিবেশই তাকে শিখিয়েছে চুরিবিদ্যা। কে না জানে অপরাধ প্রবণতা পরিবেশের দোষেই প্রকাশ পায়। চোরকে যদি সাধু সংসর্গে রাখা যায়, তাহলে সে যে চুরিবিদ্যা ছাড়তে পারে না এমন অনেক গল্পই তো আমাদের জানা। তবে দীর্ঘকাল পরে নতুন পরিবেশে থাকতে থাকতে পূর্ব-বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হতে বাধ্য।

তাই পরিবেশের পরিবর্তন একেবারে আমূল পরিবর্তনই আনায়। অতিকায়রা ক্ষুদ্র হতে আরম্ভ করে, বনের বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়, দস্যু সাধুতে পরিণত হয়, সাধুকে তস্কর বানায়।

পৃথিবীর অতীত পরিবেশ ও বর্তমানে পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব ঃ

সেই কোন্ বিস্মৃত অতীতে,
পুণ্য এক রক্তাক্ত প্রভাতে,
বিচ্ছিন্ন বলয় হতে জেগেছিলে তুমি হে বরদে !
আপন অবগুণ্ঠন হতে ঝরাইয়া বারিরাশি
নিভাইলে তপ্ত বক্ষঃজ্বালা।
কটিদেশে জড়াইলে সমুদ্র মেঘলা,
ক্রীড়াচ্ছলে আনাইলে জীবে ও উদ্ভিদে।
এক হাতে সুধারস, হলাহল লয়ে অন্য হাতে
ভারসাম্য রাখিলে জগতে।

বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছু স্থিতিশীল নয়। অতি ধীর ও মন্থর হলেও সবার মধ্যে সূচিত হচ্ছে পরিবর্তন। এমন যে মহাকাশের মহান বাসিন্দা সূর্যদেবরা তারাও জন্মমাত্র যে পরিবেশ লাভ করে সে পরিবেশকেও চিরকাল আঁকড়ে রাখতে পারে না। ধীরে ধীরে তাদের দেহেও নামে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন, নামে জরা, আসে মৃত্যু— একেবারে শেষ পরিণতি।

পৃথিবীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তার জন্মলগ্ন থেকে এপর্যন্ত প্রায় চারশ' কিংবা সাড়ে চারশ' কোটি বছর ধরে পরিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছে বর্তমান পরিবেশ। প্রাকৃতিক নিয়মে উক্ত পরিবেশেরও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। অথবা পরিবর্তন সব সময়ই চলছে। কিন্তু এই পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম ও মানুষের জীবনকাল এত সংক্ষিপ্ত যে সামান্য দু-চার পুরুষের ব্যবধানে আমরা কোন কিছুই বুঝতে পারি না।

বিজ্ঞান কিন্তু লক্ষ্য করেছে সেই সামান্যতম পরিবর্তনকে। তার

তীব্র ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি অগ্রসর হয়ে গেছে আজ থেকে কোটি কোটি বছর পূর্বের দিনগুলোর দিকে। তাই আমরা জানতে পেরেছি, কেমন করে পৃথিবীর পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তন পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদদেহে কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের পরিবেশ বলতে মাটি, জল, হাওয়া, আলো এবং পারিপার্শ্বিক জীব ও উদ্ভিদ ইত্যাদি—যা থেকে আমরা জীবন ধারণের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে থাকি। প্রথমে চিন্তা করা যেতে পারে আদিম পৃথিবীর সেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন দিনগুলোর কথা। সেদিন জল ছিল না, আজকের মত আবহাওয়া ছিল না, এক গাঢ় কুজ্‌ঝটিকার অন্তরালে যেন মুখ ঢেকেছিল পৃথিবী। ভারী একটা আবহমণ্ডল তাকে অবশ্য ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু যেই আবহমণ্ডলে বর্তমানের মত নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি ছিল না। ছিল প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প এবং কিছু কিছু হাইড্রোজেন। সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর রশ্মিগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উর্ধ্বাকাশে ওজোনের স্তরও তখন গঠিত হয়নি। একদিকে অতিতপ্ত পরিবেশ, অন্যদিকে আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎক্ষরণ, মহাকাশ থেকে আগত আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ও গামা রশ্মির বিকিরণ প্রভৃতি জীব ও উদ্ভিদদেহের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। তাই জীব কিংবা উদ্ভিদ কেউই আসতে পারেনি সে সময়। তবে সংশ্লেষিত হয়েছিল কিছু কিছু সরল জৈব যৌগ এবং সেই ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত পরিবেশে পৃথিবী তার বায়ুমণ্ডলে জৈব যৌগগুলিকে ধারণ করেই তৃপ্ত ছিল।

কোটি কোটি বছরের ধীর ও মন্থর পরিবর্তনে পৃথিবীর পরিবেশটা শীতল হলো। আকাশ থেকে নামল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। তারপর মহাসমুদ্রের তলদেশে ডুব দিল পৃথিবী। বৃষ্টিধারার সঙ্গে আকাশে সংশ্লেষিত জৈব যৌগগুলি নেমে এসেছিল ধরিত্রীর বুকে। এবার জল থৈ থৈ পরিবেশে জৈব যৌগ থেকে আত্মপ্রকাশ করলো ব্যাকটিরিয়া জাতীয় জীব। তারপর আরও কোটি কোটি বছর পরে সাগর জলে আসে সবুজ শৈবাল, খোলসযুক্ত প্রাণী, স্পঞ্জ, একনালী দেহী প্রাণী ও

কৃত্রিমজাতীয় জীব। প্রায় একশ কোটি বছর ধরে প্রোটোরোজোয়িক মহাযুগে রাজত্ব করে গেছে ওরা।

পৃথিবীর স্থলভাগ তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। বায়ুমণ্ডলে আসেনি পর্যাপ্ত অক্সিজেন, অব্যাহত আছে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলির আগমন। তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বেশ কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা পড়েছিল বায়ুতে। এই অবস্থায় জলে যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশই পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে নিজের চারদিকে শক্ত আবরণ তৈরি করে নিত। সবাই ছিল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

সাগরের বুকে সে সময় দলবদ্ধ হয়ে ভেসে থাকতো অতি ক্ষুদ্র প্লাংক্টনরা। পরিবেশে তেমন অক্সিজেন ছিল না। উপায় না পেয়ে অক্সিজেনের অভাবে তাদের অনেকেই অবাত শ্বসন প্রণালীতে শ্বাসকার্য চালাতো।

তারপর কেটে যায় কত কোটি কোটি বছর। আবহাওয়ার পরিবর্তন এল। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাগর বুকে এল প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী—মাছ। আগে যেসব খোলসযুক্ত প্রাণী এসেছিল তাদের অধিকাংশই পরিবর্তিত পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারলো না। মৃত্যুবরণ করে সাগর তলায় যেন পাহাড় রচনা করলো। খোলসযুক্ত প্রাণীদের রাজত্ব শেষ হলো আর শুরু হলো মাছেদের রাজত্বকাল বা মৎস্যযুগ।

অল্প কয়েক কোটি বছরের মধ্যে মহাসাগর যেন কপালে টিপ পরলো। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করলো স্থলভাগ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অব্যাহত থাকায় এবং ভূ-পৃষ্ঠের যেখানে সেখানে ফাটল সৃষ্টি হওয়ায় বাতাসে এল প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হতে হতে প্রথম থেকেই বাতাসে অল্প অল্প করে অক্সিজেন জমা হচ্ছিল। এর পরেই ঊর্ধ্বাকাশে গঠিত হলো ওজোনের স্তর। ফলে এতদিনে জীব ও উদ্ভিদ দেহের পক্ষে ক্ষতিকর রশ্মিগুলি সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসার সুযোগ পেল না। কিছুটা সুস্থ ও সুন্দর হলো তখনকার পৃথিবীর পরিবেশ।

আবহমণ্ডলে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হওয়ায় স্বভোজী উদ্ভিদের হলো দারুণ সুবিধা। তারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বনকে আত্মসাৎ করে অক্সিজেনকে পরিত্যাগ করলো বাতাসে। সেই থেকে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করলো। অনুকূল পরিবেশে সে সময় ডাঙায় এক-মাত্র উদ্ভিদদেরই হয়েছিল বাড়বাড়ন্ত। সেই উদ্ভিদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল ফার্ণ জাতীয় এবং কিছু নগ্নবীজা।

এর অল্প কিছুকাল পরে এমন এক অবস্থা এসেছিল যে, ডাঙায় তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। কেবল গাছ আর গাছ। পরিবেশটা ছিল বেজায় স্যাঁৎসেঁতে, বায়ুতে ছিল প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। তাই ডাঙায় যেমন অত্যন্ত ঘন বনের সৃষ্টি হয়েছিল তেমনই গাছগুলোর উচ্চতাও ছিল কম করে পঞ্চাশ ষাট ফুট। ডাঙায় তখন জীব বলতে ছিল কিছু কিছু উভচর, জল থেকে সদ্য আগত অতি কুৎসিত আকারের অল্প সরীসৃপ এবং বনের অভ্যন্তরে এসেছিল পতঙ্গ। উভচর ও সরীসৃপরা কেবল সাগরতীরে ঘুরে বেড়াতো। এত ঘন বন ছিল যে, সে সময় বনের মধ্যে প্রবেশ করার সাধ্য কারও ছিল না। প্রায় ছত্রিশ কোটি বছর ধরে চলেছিল এই পরিবেশ। এবং এত দীর্ঘসময় ধরে রাজত্ব করে গেছে ডাঙায় উদ্ভিদ ও জলে মাছ। ছত্রিশ কোটি বছরের এই সময়কালকে প্যালিওজোয়িক মহাযুগ বা মৎস্যযুগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্যালিওজোয়িক মহাযুগের শেষের দিকে রুক্ষমূর্তি ধারণ করে প্রকৃতি। এক কথায় পুরাতনকে নিয়ে সে আর তৃপ্ত থাকতে চাইল না। পুরাতন পরিবেশ এবং পুরাতন বাসিন্দাদের পরিত্যাগ করার জন্য আবহাওয়ায় ঘন ঘন পরিবর্তন আসতে লাগলো। তারপরেই নেমে এল তুষারযুগ। এই তুষারযুগের সময়কালটাও কয়েক লক্ষ কিংবা কোটি বছর। বরফের তলায় চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেদিনের অধিকাংশ উদ্ভিদ এবং মাছেদের একাধিপত্যও এরকম হলো শেষ।

তুষার যুগ তথা তুষারের পরিবেশও স্থায়ী হলো না। তাকেও

বিদায় গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু ফিরে এল না পৃথিবীর পুরাতন পরিবেশ। সবই হলো নতুন। নতুন পরিবেশ, নতুন জীব ও নতুন উদ্ভিদ। আগে যেখানে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদেরা বিরাজ করতো এখন সেখানে প্রাধান্য লাভ করলো নগ্নবীজীরা। আর সাগর ছেয়ে গেল সরীসৃপে সরীসৃপে। ডাঙায় ঘন বন না থাকলেও বাতাসে তখনও ছিল যথেষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড। তাই নগ্নবীজীদেরও হলো উন্নতি। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ায় ডাঙার সরীসৃপরাও হয়ে উঠলো অতিকায়। তারা অনুকূল পরিবেশ লাভ করে বংশবিস্তার করে চললো এন্তারভাবে। প্রায় বার কোটি বছর ধরে পৃথিবীকে ভোগ করে গেছে কেবল সরীসৃপরাই। উক্ত সময়কালকে বলা হয় মেসোজোয়িক মহাযুগ।

প্রকৃতি যেহেতু নতুনের পিয়াসী, তাই পুরাতনকে চিরকাল অটুট রাখতে সে ভালবাসে না। মাছদের মত একদিন এই সরীসৃপদেরও ত্যাগ করে বসলো। আবহমণ্ডলেরও পরিবর্তন এসে গেল অনেকখানি। অক্সিজেনের পরিমাণ আরও বেড়েছে, উর্ধ্বাকাশে সুগঠিত হয়েছে ওজোনের স্তর। আর এসে গেছে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন। সবল হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটাও।

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোও কম এসেছে। আগের মত আগ্নেয়গিরিরা ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করে না। পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন শিলাস্তরটা বিস্তৃত হওয়ায় যেখানে সেখানে ফাটলও সৃষ্টি হয় না। তাই বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইডও সুযোগ পেল না বাতাসে মিশতে। সৃষ্টি হলো যেন রমণীয় এক পরিবেশ। কিন্তু তাও স্থায়ী হলো না।

হঠাৎ প্রকৃতির কি খেয়াল হলো! মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষ-ভাগ থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করলো একটানা শুষ্ক প্রবাহ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পেল। চারদিকে দেখা গেল রুক্ষ পরিবেশ। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারল না সেদিনের বাসিন্দারা। বিলীন হতে আরম্ভ করলো আকাশছোঁয়া ঘন অরণ্যানী এবং অরণ্যের উপর নির্ভরশীল অতিকায় সরীসৃপের দল। ওদের পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে স্থান লাভ করলো সপুষ্পক একবীজপত্রী উদ্ভিদ-এর স্তন্যপায়ী

প্রাণী। সূত্রপাত হলো আধুনিক স্তন্যপায়ীদের যুগ বা কেনোজোয়িক মহাযুগ।

অবশ্য স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব হয়েছিল সরীসৃপদের রাজত্বের স্বর্ণযুগে। অর্থাৎ মেসোজোয়িক মহাযুগের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় ঐ স্তন্যপায়ীরা ছিল নিতান্ত ছোট ছোট—অনেকটা আজকের দিনের ইঁদুরদের মত। অতি ভয়ঙ্কর সরীসৃপদের দৃষ্টি এড়িয়ে গর্তের ভেতরেই বাস করতো। কালের গতিতে, এদের যে এতখানি উন্নতি ঘটবে, সেকথা বোধহয় স্বয়ং প্রকৃতি দেবীরও চিন্তার অগোচর ছিল। কোথায় চলে গেল অতিকায় সেইসব ডাইনোসোর, কোথায় অন্তর্হিত হলো ছোটখাট উড়োজাহাজের মত উড্ডুক্কু সরীসৃপ টেরাডাকটাইল, আর কোথায় তলিয়ে গেল একবীজপত্রী উদ্ভিদদের রাজত্ব। দেখতে দেখতে পরিবর্তিত পরিবেশে, কেনোজোয়িক মহাযুগের দ্বিতীয় ভাগে আবির্ভূত হলো লোমশহাতী বা ম্যামথ, খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র, আধুনিক পালকওয়ালা পাখী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

কেনোজোয়িক মহাযুগের প্রথমভাগে কিছুকাল ধরে শুষ্কপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি হলো এক মনোরম পরিবেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে পরিবেশও দীর্ঘকাল স্থায়ী হলো না। পরে পরেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো শৈত্যপ্রবাহ। শৈত্যপ্রবাহের পর আবার শুষ্ক প্রবাহ। জীবজন্তু-উদ্ভিদ সবাই বিব্রত বোধ করলো, সবারই নিরাপত্তা হলো বিঘ্নিত। প্রকৃতির যূপকাষ্ঠে মাথা পেতে দিতে হলো সবার। অর্থাৎ আবার সেই হারিয়ে যাওয়ার পালা।

পর পর শুষ্কপ্রবাহ ও শৈত্যপ্রবাহ হানা দিতে থাকায় পৃথিবীর সর্বত্রই সৃষ্টি হলো এক রুক্ষ পরিবেশ। কেবল নিরক্ষ অঞ্চলেই যথারীতি কিছু কিছু বৃষ্টিপাত অব্যাহত ছিল। কিন্তু পূর্বের মত ততটা নয়। পরিবর্তিত পরিবেশে তৎকালীন জীবজন্তু, গাছপালা হারিয়ে গেল। কেউবা নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে জীবন মরণ পণ করলো। যারা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলো তারাও অবিকৃত থাকলো না। দেহে প্রকাশ পেলো নানা বৈশিষ্ট্য। তাই নিরক্ষ অঞ্চলের ঘন বনে একদিন দেখা

গেল কাষ্ঠল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, কাঠবাদাম ও আঙ্গুর জাতীয় লতা। বনভূমি থেকে দূরে অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জেগে উঠলো তৃণভূমি। আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অরণ্যের অভ্যন্তরে কোথা থেকে আমদানি হলো বানর জাতীয় প্রাণী।

পৃথিবীর কোন কিছু যেহেতু স্থিতিশীল নয়, তাই রুক্ষ পরিবেশকেও একদিন বিদায় গ্রহণ করতে হলো। পুনরায় সূচিত হলো মনোরম পরিবেশ। প্রকৃতির উদ্যত খড়্গ অনেক আগেই নেমে এসেছিল ম্যামথ, খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র ইত্যাদির উপর। পরিবর্তিত পরিবেশ মাত্র কয়েকটির বংশধারা টিকে গেল। আর প্রায় তিন কোটি বছরের ব্যবধানে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে বানর থেকে আত্মপ্রকাশ করলো অর্ধবানরাকৃতি মানুষ। ওদের বেশ কিছু প্রজাতি আবার হারিয়ে গেছে পরবর্তী তুষার যুগে। অর্থাৎ নানা পরিবর্তন এলেও মনোরম পরিবেশটা বেশ কিছুকাল টিকে ছিল। ভালভাবে বংশবিস্তার করতে পেরেছিল জীব ও উদ্ভিদরা। কিন্তু প্রকৃতির সহ্য হলো না। নেমে এল তুষারযুগ।

তুষারযুগ পৃথিবীর বুকে বার বার হানা দিয়েছে। আর তুষার যুগ মানেই এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন। পুরাতনের বিলুপ্তি এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীব ও উদ্ভিদদের আবির্ভাব। অনেকের মতে শেষ তুষার যুগটি শেষ হয়েছে আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। আর আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগে। প্রকৃত-পক্ষে ঐ সময় থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের রাজত্বকাল। ব্যাকটিরিয়া, খোলসযুক্ত প্রাণী, মাছ, সরীসৃপ, ম্যামথ প্রভৃতির রাজত্বের শেষে পঞ্চম মহাযুগের সর্বশেষ স্তরের শাসকগোষ্ঠী। ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। বুদ্ধিবলে সে বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে বন্দিনী করেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র চালাচ্ছে তার সফল অভিযান।

কিন্তু সে কি তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে একবার অতীতের দিকে ভালভাবে তাকাতে চেষ্টা করছে ? অতীতকে সামনে রেখে একবারও কি সে চেয়েছে আপন ভাগ্যলিপিটা পাঠ করতে !

অতীতের দিকে তাকালে অবশ্যই মনে হবে, পৃথিবীর আজকের

পরিবেশও চিরস্থায়ী নয়, হতেও পারে না। অতএব চিরটাকাল বজায় থাকবে না মানুষের রাজত্ব। আগে আগে যেমনটি হয়েছে, ঠিক সেইভাবে হয়তো একদিন প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে একটানা শুষ্কপ্রবাহ কিংবা শৈত্যপ্রবাহ। অথবা কোন না কোন সময়ে পরিবর্তন আসতে আসতে হানা দেবে চরম পরিবর্তন—সেই তুষার যুগ। এমনকি ভয়ঙ্কর কোন বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর মেরুদ্বয়েরও পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। কেন না, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ চিরকালই অশান্ত থেকে যাবে। আজ চারশ কোটি বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর উপরিভাগের শিলা ও মাটির স্তরটা মাত্র চল্লিশ মাইলের মত পুরু হয়েছে। তার তলায় অবস্থান করছে গলিত তরলপদার্থ। উপরের প্রচণ্ড চাপের ফলে উত্তাপও সেখানে কল্পনাতীত। এত চাপ এবং এত তাপের প্রভাবে সেই তরলের সবটা কোনদিনই কঠিনে রূপান্তরিত হতে পারবে না। অভ্যন্তরে কোন কারণে বিরাট রকমের যদি কিছু একটা পরিবর্তন আসে তাহলে মেরুদ্বয়ের পরিবর্তন আদৌ অসম্ভব নয়। এবং অসম্ভব নয় বলেই পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আগমন সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। তা না হলে কে ভেবেছিল অতিকায় সরীসৃপরা বিদায় গ্রহণ করবে এবং তাদের স্থান দখল করবে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা ?

বর্তমানে আমাদের অবশ্য ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। সদ্য সদ্য কোথাও কোন বিরাট পরিবর্তন আসবে বলে মনে হচ্ছে না। অপরদিকে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজে ধরা পড়ে, পরিবর্তন এক আধ হাজার বছরে আসে না। তেমন আমূল পরিবর্তন আসতে হলে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ বছরের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আজকের পরিবেশের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। যদিও পৃথিবীর মনোরম পরিবেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তবু এত তাড়াতাড়ি যে পৃথিবী সংহারিণী মূর্তি ধারণ করবে না সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা আছে। শুধু ভয় ঐ বুদ্ধিমান মানুষ জাতটার জন্যই।

অপরপক্ষে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর গাঁটছড়া বাঁধা। যতদিন না সূর্য-দেহে জরা ভর করছে ততদিন পৃথিবী অবশ্যই টিকে থাকবে। সেই সঙ্গে

টিকে থাকবে তার জীব ও উদ্ভিদজগৎ। মাঝে মাঝে কেবল পরিবর্তনের পর পরিবর্তনই আসবে। তবে যত পরিবর্তন আসুক না কেন বন্ধ্যা সে কোনকালেই থাকবে না। পরিবেশের তারতম্যের জন্য জীব ও উদ্ভিদ-দেহে প্রকাশ পাবে নানা বৈশিষ্ট্য। যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে পারবে তাদের বংশধারা টিকে থাকবে, আর যারা পারবে না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উক্ত কারণে হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে মানুষের রাজত্বও। নতুন পরিবেশে নতুন যে বীরের আবির্ভাব হবে সেইই ভোগ করবে পৃথিবীকে।

এখন দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন আসতে অনেক বিলম্ব। কিন্তু ভয় অন্যত্র। আজ মানুষ বিজ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য আমাদের শুভবুদ্ধির স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এবং স্বার্থের মোহে আমরা আমাদের উত্তর পুরুষদের কথা আদৌ চিন্তা করছি না। অথচ আমাদের বংশ-ধারাই আমাদের অমর করে রাখবে। আর ঐখানেই লুকায়িত আমাদের বৃহত্তম স্বার্থ।

বিজ্ঞানের কৃপায় সবকিছু জেনে শুনেও আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই যেন ডেকে আনছি। যেন ইচ্ছে করেই ভয়ঙ্কর এক মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছি। সে মারণযজ্ঞ—পৃথিবীর পরিবেশটাকে পরিবর্তিত ও দূষিত করে দেওয়া। প্রকৃতির হস্তক্ষেপের পূর্বেই আমরা হস্তক্ষেপ করছি।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, পরিবেশ যেমন জীব ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনই জীব ও উদ্ভিদের প্রভাবও প্রকৃতির উপর কিছু কিছু পতিত হয়। তবে বর্তমানে মানুষের মত কেউ প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

আদিতে মানুষের পূর্বপুরুষ যখন সাধারণ এক শাখাচারী জীবরূপে বিচরণ করতো, তখন সে অপরাপর জীব ও উদ্ভিদের মত পরিবেশকে অতি অল্পই প্রভাবিত করেছিল। এবং যে অঞ্চলে তার আবির্ভাব হয়েছিল কেবল সেইখানে সীমাবদ্ধ ছিল তার প্রভাব।

একদিন ওদের কয়েকজন খাদ্যের অন্বেষণে শাখা ছেড়ে নেমে এসেছিল মাটিতে। সেইদিনই সে নিয়মভঙ্গ করেছিল প্রকৃতির। লক্ষ-লক্ষ বছর পরে স্বাভাবিকভাবেই ওদের বংশধারার মধ্যে এল পরিবর্তন। হাত পায়ের গড়ন পাল্টে গেল এবং পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করলো হাত ও পাকে। তখন বৃক্ষশাখাকে অবলম্বন করে রাত্রিবাসের অভ্যাস আর থাকল না। লাঠি ধরতে শিখলো, দৃষ্টি হলো সামনে প্রসারিত, মস্তিষ্কেরও হলো দারুণ উন্নতি। প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই জোরদার হলো প্রকৃতির উপর তার প্রভাব।

আরও কেটে গেল কতকাল। মানুষ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো, পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও বানাতে শিখলো। বনের ফলমূল, কচিপাতা থেকে আরম্ভ করে শিকার করা পশু-মাংস প্রভৃতি সবই ভক্ষণ করতে লাগলো। একেবারে প্রথম শ্রেণীর খাদকে পরিণত হল মানুষ। একরকম সর্বভুক হলো সে। অরণ্যের ডালপালা ভেঙ্গে লাঠি বানালো, তৃণভোজীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো, বন্য মৃগ থেকে ছোট ছোট খরগোস এমনকি পাখী পর্যন্তও প্রাণ হারাতে থাকলো। সেইদিন থেকে প্রকৃতি পরাজিত হল মানুষের কাছে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার অশুভ সূচনা হলো সেইখানেই।

মানুষ দলবদ্ধ হলো, যাযাবর হলো। এক অরণ্য থেকে ছুটতে লাগলো অন্য অরণ্যে। অর্থাৎ এক জায়গায় কিছুকাল অবস্থান করলে খাদ্যের ঘাটতি ঘটতো বলে সে স্থান পরিত্যাগ করে নতুন অরণ্যের সন্ধান করতো এবং যেখানে পর্যাপ্ত আহারের গন্ধ পেতো সেইখানেই সাময়িকভাবে বসতি স্থাপন করতো। তাই তাদের দ্বারা সেদিন মাত্র একটি অরণ্য প্রকম্পিত হতো না, অরণ্যের পর অরণ্য তোলপাড় করে ছাড়তো।

কেটে গেল কত লক্ষ-লক্ষ বছর। আরও একধাপ এগিয়ে গেল মানুষ। এতদিনে বন্দী করলো অগ্নিদেবতাকে। প্রকৃতপক্ষে অজেয় হয়ে উঠলো এতদিনে। অরণ্যের অতি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুরাও এবার হার মানলো তাদের কাছে।

এরপর একটানা তার জয়যাত্রার ইতিহাস। মুখে ভাষা এলো, বনের পশুকে পোষ মানালো, পরিশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে কাজে লাগালো পশুদের। স্বাধীন পশুরা ক্রীতদাস হলো। মনোভাবেরও পরিবর্তন হলো তাদের। যাদের দ্বারা উপকার হবে মনে করলো তাদের ঘরে পালন করলো কিংবা কৌশলে বন্দী করলো। আর তথাকথিত হিংস্র-জন্তুদের নির্বিচারে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। মানুষের প্রভাবে বিঘ্নিত হলো প্রকৃতির ভারসাম্য।

তার পরের ইতিহাস আরও জটিল আকার ধারণ করলো। মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষিকাজে মন দিল। নদী কিংবা হ্রদের তীরে অথবা বন কেটে উপনিবেশ গড়ে তুললো। "পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু"কে করলো উদ্ধার। নিজেদের চাহিদা মেটাতে বারবার হানা দিল অরণ্যে। গাছপালাকে কেটে ঘর বানালো, আসবাবপত্র তৈরি করলো, দূর দেশে পাড়ি দিতে নৌকা গড়লো। পরিবেশের উপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব পড়লো মানুষের।

তবুও বলতে হয় এ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির উপর যতই আঘাত হানুক না কেন তাদের অপেক্ষা প্রকৃতির প্রভাবই ছিল অধিক। অর্থাৎ ভারসাম্যের দিক থেকে প্রকৃতি জয়ী ছিল। এতদিন পর্যন্ত মানুষের মনে কোন স্বার্থবুদ্ধিও স্থান পায়নি। যা কিছু করতো, সবই দলগত স্বার্থে। কোনকিছু অপচয় করতো না এবং প্রকৃতির বুক থেকে বেশী কিছু আদায়েরও ইচ্ছা ছিল না। অল্পে সন্তুষ্ট থাকতো, দলবেঁধে খাটতো, একের মুখের গ্রাস অপরে কেড়ে নিত না। কিন্তু কৃষিকাজ শেখার পরে পরেই এলো একটা বড় রকমের বিপর্যয়।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্বন্ধে চিন্তা কার মাথায় যে প্রথম স্থানলাভ করেছিল, সে কথা আমাদের জানা নেই। তবে ঐ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যে সব রকমের বিপর্যয়ের সূত্রপাত—এই সত্য সবাই উপলব্ধি করেন। যখনই মালিকানা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তখনই সৃষ্টি হলো মানুষে-মানুষে বিভেদ, বৈষম্য, রেষারেষি ও হানাহানি। যারা ছিল বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী তারা বুদ্ধিবলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে

ফেললো, বেশী জমিকে নিজের অধীনে রাখলো। ভূমিহীন হয়ে পড়লো অনেকে এবং যারা ভূমিহীন হলো তারা ক্রীতদাসত্ব বরণ করলো। মানুষের মধ্যেও এবার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়লো।

মানুষ ক্ষমতালিপ্সুও হয়ে উঠলো। আপন ক্ষমতা জাহির করতে দলপতি অথবা গোষ্ঠীপতি হওয়ার বাসনা জাগলো মনে। সেই গোষ্ঠী-পতি থেকে সূচনা হল রাজপদের। বিষয়ের বিষময় ফল ফললো এবার। অধিক ক্ষমতার লোভে রাজায়-রাজায় যুদ্ধ বাধলো, বন কেটে জনপদ তৈরি হলো, সম্পদ আহরণের জন্য প্রকৃতির বুকটাকে তছনছ করে ফেললো। ফলে কোথাও সম্পদের পাহাড় জমে উঠলো আর কোথাও অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য। সম্পদকে কেন্দ্র করে এলো চূড়ান্ত ভোগ ও বিলাস। বিলাসোপকরণ সরবরাহ করতে করতে প্রকৃতি ধীরে ধীরে নিঃস্ব ও রিক্ত হতে আরম্ভ করলো। অরণ্যসম্পদ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকায় জীবজন্তুরাও নিশ্চিহ্নের দিকে গেল। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি একেবারে যেন চষে ফেলতে আরম্ভ করলো মানুষ। প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল সেই একই নিয়ম।

এরপরে মানুষের আর এক ইতিহাস। বিজ্ঞানকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবার দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো তার সভ্যতার রথ। সেই সঙ্গে প্রকৃতির বুকে হানলো নিষ্ঠুর আঘাত। লুণ্ঠিত হলো ভূগর্ভস্থ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। স্থাপিত হল কলকারখানা, শহরের পর শহর গড়ে উঠলো, জীবনেও নিরাপত্তা এল। জনসংখ্যাও বেড়ে চললো হু হু করে। যে মানুষ এতকাল কেবলমাত্র বনজঙ্গলকে অপসারিত করে নিয়মভঙ্গ করছিল, এবার নিয়ম ভাঙ্গতে আরম্ভ করলো সর্বত্র। বায়ুকে, মাটিকে, জলকে, কাউকে ঠিক থাকতে দিল না। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হলো মানুষের কাছে। প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হল প্রকৃতি।

পরিবেশের সমতা হ্রাসে মানুষের হস্তক্ষেপ

ক্রিয়া যেথা, প্রতিক্রিয়া সেথা।
সমান ও বিপরীতমুখী, বিশ্বের নিয়ম চিরন্তন।
বলেছেন জ্ঞানী নিউটন।

পৃথিবীর জীবগোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। বুদ্ধিবলে প্রকৃতির কাছ থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করে এবং নানা রোগ ব্যাধিকে জয় করে সে তার বংশবিস্তার করে চলেছে অপ্রতিহত-ভাবে। আগে জনসংখ্যা কিন্তু এত ছিল না। বিভিন্ন গবেষকের মতে তাম্রযুগের শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ কোটির মত। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বাড়ার খুব একটা সুযোগ পায়নি। খ্রীষ্টজন্মের সময়ে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল আনুমানিক ৩০ কোটি। অর্থাৎ প্রায় তিন কিংবা চার হাজার বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছিল ২০ কোটির মত।

অনেকের মতে এই সংখ্যাটা দীর্ঘকাল ধরে স্থির ছিল। রাজায় রাজায় সবসময় যুদ্ধ বিগ্রহ, মারাত্মক সব রোগব্যাধি, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ-মহামারী ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বংশবিস্তার করতে পারেনি। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে ওষুধপত্র আবিষ্কার করতে থাকায় রোগব্যাধিকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। পরের দিকে কিছুটা নিরাপত্তা আসে। কোন কোন রাজার আমলে দীর্ঘ শান্তিও বিরাজ করতো। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ১৭০০ বছর পরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হয়েছিল ৬০ কোটি। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ১৭০০ বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বাড়তে আরম্ভ করলো। ১৯০০ সালে সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫৫ কোটি। এবার মাত্র

ত্রিশ' বছরে হলো প্রায় আড়াইগুন। অতঃপর জনসংখ্যার যেন বিস্ফোরণ ঘটলো। ১৯৩০ সালে হলো ২০০ কোটি। ১৯৬০ সালে লোকগণনায় জানা গেল জনসংখ্যা ৩০০ কোটিতে গিয়ে ঠেকেছে। ১৯৭০ সালে ৩৬৩ কোটি আর ১৯৮০ সালে দেখা গেল প্রায় ৪০০ কোটির মত। মাত্র বিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ১০০ কোটি। এইভাবে যদি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে তাহলে ২০০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিও ছাড়িয়ে যাবে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটা বড় কারণ, জীবনে নিরাপত্তা আসা এবং অধিকাংশ রোগ ব্যাধিকে দমন করা। আগে কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, ধনুষ্টঙ্কার এবং অন্যান্য জীবাণু ও ভাইরাসঘটিত রোগে প্রতি বছর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাতো। তার উপরে ছিল নানাবিধ শিশুরোগ। অস্ত্রোপচার পদ্ধতি উন্নত না থাকার জন্য বহু মাকেও প্রতি বছর প্রাণ হারাতে হতো। আঁতুড় ঘরে মারা যেতো বহু শিশু। আজ ভেষজ বিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটায় জীবনে এসেছে যথেষ্ট নিরাপত্তা। যে কোন নবজাতক আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারে, ইচ্ছে করলে আমি পৃথিবীর জলবায়ুকে শতবর্ষ ধরে ভোগ করতে পারি। যক্ষার মত এককালের এমন ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হলেও রোগীরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে এবং বলতে পারে "আমি মরবো না, মরতে পারি না"। তাই আজ যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, সে হারে মানুষ মরছে না।

আজকের পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপের মূলেই রয়েছে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু একদিকে খাদ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, অপরদিকে তেমনই বৃদ্ধি পাচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং সখ-সৌখিনতার জিনিসপত্র। বেড়ে চলেছে কলকারখানা, আর সম্প্রসারিত হচ্ছে কৃষিযোগ্য জমি। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন তো বাড়ছে না! তাই বনজঙ্গল কাটতে হচ্ছে, মরুভূমির মত জায়গায়ও জলসেচের দ্বারা ফসল ফলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনকি পাহাড়ের বুককেও খালি রাখছে না। কিন্তু তাতেও খাদ্যের চাহিদা

মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে একই জমি থেকে দুবার কিংবা তিনবার ফসল তোলার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে অধিক ফসলও উৎপাদন করতে হচ্ছে। আর হাজার হাজার একর জমিতে একই সঙ্গে একই ফসলের চাষ করতে হচ্ছে। বছরের অধিকাংশ সময় সবুজ হয়ে আছে মাঠের পর মাঠ।

আমরা জানি, বনে অথবা পতিত জমিতে একই ধরনের গাছপালা থাকে না। বট, অশ্বথ, খেজুর, বাবলা প্রভৃতি গাছ যেমন জন্মায় তেমনই জন্মায় নানা ধরনের লতা, ছোট ছোট ঝোপ, তৃণ ইত্যাদি। সেখানে দীর্ঘজীবীদের সঙ্গে বাস করে বর্ষজীবীরা। আবার কারও কারও জীবনকাল মাত্র কয়েক মাসেই শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদদের দেহাবশেষ ঐ মাটিতেই মিশে যায়। আর মিশে যায় দীর্ঘজীবীদের পাতাও। তাই সেখানকার মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ গাছকে জন্মগ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

ফসলের জমি থেকে আমরা ফসল কাটি একেবারে গোড়া থেকেই। জমিতে এককণাও রাখতে চাই না। তাছাড়া ফসলের ক্ষতি হবে বলে অন্য যে কোন ধরনের গাছ, আগাছা, ঘাস ইত্যাদিকে উৎপাটিত করে ফেলি। সবুজ উদ্ভিদের দেহাবশেষ মাটিতে আদৌ মিশতে পারে না। বছরের পর বছর ঠিক এইভাবেই চলছে আর হ্রাস পাচ্ছে জমির উর্বরতা। তাই কৃত্রিমভাবে উর্বরতা বাড়াতে গিয়ে ব্যবহার করতে হচ্ছে নানাপ্রকার রাসায়নিক সার। ঐ সারের প্রভাবে মাটিতে বসবাসকারী বহু উপকারী জীব ও জীবাণুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের অক্সাইড জলধারার সঙ্গে মাটিতে নেমে এলে তাকে উদ্ভিদের খাদ্যে রূপান্তরিত করারও কেউ থাকছে না। অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে। সার প্রভাবে মাটি হয়ে উঠছে শক্ত ও অ্যাসিডিক। জলধারণ ক্ষমতার হ্রাস পাচ্ছে আর ক্ষয়ও হচ্ছে।

সব সময় একই জমি থেকে একই ফসল তুলতে গিয়ে এবং একসঙ্গে হাজার হাজার একর জমিতে একই ফসল বোনার ফলে বহু ক্ষতিকারক

পোকা, জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ হচ্ছে। ওরা পরজীবী। দিগন্ত বিস্তৃত একই শস্যের ক্ষেত লাভ করায় এবং সব ঋতুতে অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় বংশবিস্তার করছে অতি দ্রুতগতিতে।

অনেকেরই জানা আছে, বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের দেহে বিশেষ বিশেষ পরজীবীরা বাসা বাঁধে। যেমন ধানগাছের রোগপোকারা ধানগাছকে আক্রমণ করে, আলুগাছের রোগপোকারা আলুগাছকেই আক্রমণ করে। ধানগাছের রোগপোকারা আলুকে আক্রমণ করে না বা আলুগাছের রোগপোকারা ধানগাছকে আক্রমণ করতে আসে না। একই সঙ্গে মাঠের পর মাঠ একই ফসলে ভরে ওঠায় ওদের বংশবিস্তারে হচ্ছে দারুণ সুবিধা। তাই ফসল বাঁচাতে কৃষকদের বাধ্য হয়েই প্রয়োগ করতে হচ্ছে কীটনাশক বিষাক্ত সব ওষুধ বা পেস্টিসাইড।

উক্ত পেস্টিসাইড ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। পেস্টি-সাইড যেমন রোগ পোকাদের ধ্বংস করছে তেমনই ধ্বংস করছে মাটির উপকারী জীবাণুদের। জলের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে, আবার সেই জল যাচ্ছে পুকুরে, নদীতে ও সমুদ্রে। ফলে সমস্ত জায়গার জল হচ্ছে দূষিত। জলচর জীবরাও এদের কবলে পড়ছে।

প্রতিক্রিয়া মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুদের উপরেও পড়ছে। মানুষ মাছকে ভক্ষণ করছে, জল ব্যবহার করছে এবং ফসলও গ্রহণ করছে খাদ্য হিসাবে। সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদদেহেও সঞ্চিত হয় কতকগুলো অবাঞ্ছিত পদার্থ। অজ্ঞাতসারে সেগুলোও প্রবেশ করছে মানব শরীরে।

অবশ্য একথাও সত্য যে, কিছু কিছু বিষাক্ত ওষুধের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে থাকে না। মাত্র বছর খানেকের মধ্যে সেগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়ে যায়। এই অবস্থায় বিষক্রিয়া আর আদৌ থাকে না। কিন্তু ডি. ডি. টি, সীসা বা আর্সেনিক বা পারদঘটিত ওষুধ, ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি অতি বিপজ্জনক পেস্টিসাইড। ওরা তাড়াতাড়ি বিশ্লিষ্ট হয় না। বিষক্রিয়া ছড়ায় প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত।

অথচ এইসব পেস্টিসাইড কৃষকদের না ছড়িয়েও উপায় থাকে না। দেখা গেছে, একই ধরনের ওষুধ বার বার একই কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে শেষের দিকে আদৌ ফল পাওয়া যায় না। তখন অধিকতর বিষাক্ত ওষুধকে প্রয়োগ করতে হয়।

ফল না পাওয়ার কারণ অবশ্য আছে। একই ওষুধ বার বার প্রয়োগের ফলে পতঙ্গ ও রোগপোকারা সহনশীলতা অর্জন করে নেয়। সেই কারণেই কোন কাজ হয় না এবং অন্য ওষুধের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষাক্ত ওষুধসমূহে অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবরাই সহনশীলতা অর্জন করতে পারে। মানুষ কিংবা উন্নত জীবরা তা পারে না। উন্নত জীবদের শারীরিক গঠন অতীব জটিল এবং জটিল দেহের ক্রিয়াকলাপও। জীবাণুদের গঠন অতি সরল। অতি অল্পেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

অতএব উন্নত প্রথায় চাষ করতে গিয়েও আমরা প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করে চলেছি। একশ্রেণীর জীবকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছি আর এক শ্রেণীর জীবের বংশবিস্তারে সাহায্য করছি। সেচের ফলে মরুভূমিতে ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে সেখানেও সৃষ্টি করছি কিছু কিছু পতঙ্গ ও জীবাণুদের। অপরদিকে আগাছার পরিমাণও বাড়িয়ে ফেলছি। একই জমিতে বার বার লাঙ্গল দেওয়ার ফলে আগাছাদের বংশবিস্তার করতে সুবিধা হচ্ছে। ওরা জন্মায় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জীবনচক্র শেষ করে নেয়। তাদের বীজ আবার এত ক্ষুদ্র যে বায়ুতে ভর করে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়তে অসুবিধা হয় না। ছাদের উপর একখানা শুকনো মাটির ডেলাকে রেখে দিলে বৃষ্টির সময় দেখা যায়, ওতেও ঘাস গজিয়েছে। তার কারণ এই নয় যে, ডেলাটার ভেতরে ঘাসের বীজ ছিল। বীজগুলো বাতাসে উড়ে এসেই পড়েছে এবং অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বীজ থেকে চারা বেরিয়েছে।

আগাছা ফসলের পক্ষে এবং অন্যান্য ভাল উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত

ক্ষতিকর। অথচ উদ্ভিদের বংশকে ধ্বংস করে আমরা আগাছাদের বংশকেই বাড়িয়ে চলেছি।

কেবল কৃষিকাজ করতে গিয়ে যে ক্ষতিকর জীবাণুদের বংশ বাড়িয়ে ফেলছি এমন নয়, অপরাপর উপায়েও রোগজীবাণুদের বংশ বাড়িয়ে চলেছি। রোগজীবাণুরাও সহনশীলতা অর্জনের ক্ষমতা রাখে এবং তাদের দ্বারাও প্রতিক্রিয়া বড় কম হচ্ছে না।

রোগজীবাণু বিস্তারের প্রধান কারন আমাদের গৃহপালিত হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ইত্যাদি। ডিম, দুধ. মাংস প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাণীজ খাদ্যের জন্য ওদের আমরা প্রতিপালন করে থাকি। অনেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যেও প্রতিপালন করে। ব্যবসা যারা করে তারা একই জায়গায় হাজার হাজার হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করে। খাটালে গরু, ছাগল, মেষ ইত্যাদিও প্রতিপালন করে অধিক পরিমাণে।

এত সংখ্যক পশু কিংবা পাখীকে এক জায়গায় রাখতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে তাদের মধ্যে কোন রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি যাতে ওরা বাড়তে পারে তার জন্য বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন ইনজেকশান করানো হয়। অথবা নানা ওষুধপত্রও খাওয়ানো হয়। তাদের রোগ নিবারণের জন্য যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সে ওষুধগুলির বার বার প্রয়োগে বেশ কিছু সংখ্যক রোগজীবাণু সহনশীলতা অর্জন করে নেয় এবং তাদের দেহ থেকে মানুষের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু জীবাণুরা সহনশীলতা অর্জন করে নিয়েছে তাই তাদের দমনেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং অন্যান্য রোগও প্রকাশ পায়। অপরদিকে বৃদ্ধি সহায়ক ওষুধ খাওয়ানোর ফলে তাদের দেহে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থও জমে। পোলট্রির মুরগী এবং খামারে প্রতিপালিত পশুর মাংসের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হয় আমাদের দেহেও।

পোলট্রির হাঁস-মুরগী কিংবা খামারে পালিত পশুদের মলমূত্র নিষ্কাশন করারও একটা বড় রকমের সমস্যা আছে। এত অধিক মলমূত্রকে

কৃষিক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাই নর্দমাযোগে পার্শ্ববর্তী নদী কিংবা খালে নিক্ষিপ্ত হয়। উক্ত উপায়ে জলও দূষিত হয়।

কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে মানুষ পরোক্ষে পরিবেশের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে চলেছে। প্রচুর ধূলা, ধোঁয়া, পাট কিংবা তূলার আঁশ, অহরহ মিশ্রিত হচ্ছে বায়ুর সঙ্গে। আর জমা হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের কোন কোন অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি গ্যাস। এদের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উপাদানগুলির পরিমাণে যেমন তারতম্য ঘটছে তেমনই কিছু কিছু অবাঞ্ছিত গ্যাসও বায়ুতে জমা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

এদিকে কলকারখানাগুলি থেকে বর্জ্য পদার্থসমূহ নিক্ষেপ করা হচ্ছে নদীতে কিংবা সাগরে। শিল্পাঞ্চলে কিছু কিছু সীসাও ছড়িয়ে পড়ছে এবং পুরাতন ও রঙচটা দেওয়ালে জমা হচ্ছে।

পাইপে যে জল সরবরাহ করা হয়, তাও যে একেবারে বিশুদ্ধ এমন নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শহরে এমনকি পল্লীঅঞ্চলেও জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সীসার পাইপ। সীসার বিষক্রিয়া থাকলেও এক্ষেত্রে সীসা জলে দ্রবীভূত হতে পারে না। খরজলের প্রভাবে পাইপের মধ্যে লেড কার্বোনেটের শক্ত আস্তরণ গঠন করে নেয়। ফলে সীসার দ্বারা বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও পাইপে অবস্থিত ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি অশুদ্ধিগুলি জলের সঙ্গে আসে এবং মানবদেহের পক্ষে এগুলিও এক একটি অবাঞ্ছিত ধাতু।

সর্বশেষে পরমাণু বিষয়ক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ পরিবেশকে যত দিক থেকে কলুষিত করছে, মনে হয় এই দিক থেকে কলুষিত করেছে অনেক বেশী পরিমাণে। আজকাল বায়ুমণ্ডলে, সমুদ্রগর্ভে, মাটির তলায় প্রায়ই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষ এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষার

পর পরীক্ষা চালিয়ে পরোক্ষভাবে জাহির করছেন আপন ক্ষমতাকে। অথচ এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো মানেই বায়ুতে, মাটিতে ও জলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। বহুবর্ষব্যাপী এদের প্রতিক্রিয়া। উদ্ভিদদেহেও এরা সঞ্চিত হতে পারে, বংশানুক্রমে রোগ-ব্যাধি ছড়াতে পারে এবং বহু মারাত্মক রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরাই এই প্রতিযোগিতার জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁরা ভুলে বসে আছেন যে তাঁদের তৈরি আগুনের লেলিহান শিখা একদিন তাঁদেরও গ্রাস করবে।

আজ তাই কৃষির উন্নতি, শিল্পের প্রসার, নানা রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার, পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে আমরা অজান্তেই হস্তক্ষেপ করে চলেছি পরিবেশের উপর। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বহু সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে।

পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরে পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যা অধিক। শহরে নানারকম সুখ-সুবিধা আছে, সখ-সৌখিনতা মেটাবার উপকরণ আছে, চিকিৎসা ও শিক্ষার ঢালাও সুবিধা আছে, ব্যবসা কিংবা চাকরিরও সুযোগ আছে। তাই দলে দলে মানুষ ছুটে চলেছে শহরের পানে। হিসেবে দেখা গেছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশই এখন শহরের বাসিন্দা। মানুষের শহরের প্রতি আকর্ষণ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ থাকবে শহরে।

শহরগুলিতে মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ভিড় সেখানকার পরিবেশের উপর দারুণভাবে আঘাত করে চলেছে। একদিকে অজস্র দোকানপাট, কলকারখানা, যানবাহন অপরদিকে মাইকের কানফাটানো চিৎকার, গাড়ী মোটরের কর্কশ হর্ণের আওয়াজ ইত্যাদি। ধুলাবালি ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ ও বাতাস। তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে নানা সামাজিক সমস্যা। বাসস্থান সমস্যা, বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কত কি? শহর গড়তে গিয়ে আমরা আঘাত করেছি প্রকৃতির বুকে। ভারসাম্য যাকে বলে শহরে তা আদৌ নেই বললেও চলে। অথচ দেশের প্রাণ-

কেন্দ্রগুলিই হচ্ছে শহর। আর মানুষের বিবেকহীন হস্তক্ষেপের ফলে এখানকার সমস্যাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দূষণের এই ভয়াবহ রূপ দেখে আজ আতঙ্কিত চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই। দাবী উঠেছে "দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।" শিল্পোন্নত দেশগুলিতে রব উঠেছে "উন্নতির সীমা বেঁধে দিতে হবে" [সোসাইটি অব জিরো গ্রোথ]।

পরিবেশের দূষণ, দূষণের প্রভাব ও প্রতিকার

বিজ্ঞান ! মানুষকে দিয়েছো সুখ, দিয়েছো আরাম।
আর হরণ করেছো যত শান্তি ও বিরাম।
তব কটাক্ষে কলুষিত বায়ু। কলুষিত উদার আকাশ,
নদীর পবিত্র জল, বর্ষার বারিধারা, মাটির হিউমাস।
ফল, পত্র, পুষ্প আদি সবই দূষিত।
এবার কল্যাণ হস্ত কর প্রসারিত।

মানুষ নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করছে, অধিক ফসল উৎপাদনের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, যথেচ্ছভাবে কলকারখানা ও যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে। তারই বিষময় ফল পরিবেশের দূষণ, পরিবেশের সমতার বিঘ্নিতকরণ। অবশ্য এর মূলে আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই মানুষকে বাধ্য হতে হয়েছে বন কেটে জমি উদ্ধার করতে, জলসেচের ব্যবস্থা করতে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং কৃষি-শিল্প-ভেষজ বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত্নবান হতে। তাইতো প্রকৃতি হারাতে বসেছে তার স্বাভাবিক পরিবেশ। অর্থাৎ জলমণ্ডলের জল ও বায়ু-কলুষিত হচ্ছে, মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কত জীব ও উদ্ভিদ।

সত্যকথা বলতে কি, একমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষ তার সুখ-সুবিধা আদায় করতে গিয়ে পরিবেশের রূপান্তর আনছে। এই রূপান্তরকে দূষণ বলা হয়। যেহেতু পরিবেশের সব কিছু একে অপরকে প্রভাবিত করে। তাই পরিবেশের রূপান্তর এলে সেই রূপান্তরের প্রভাবও প্রত্যক্ষভাবে পতিত হয় জীবজন্তু ও গাছপালার উপর।

বলা বাহুল্য, পরিবেশের বর্তমানে যে যে সমস্যা তা এক-আধ বছরে সৃষ্টি হয়নি। কয়েক শতাব্দী আগেই এর সূচনা। আগে আসতো অতি ধীর ও মন্থর গতিতে, উনবিংশ শতাব্দীর পরে—সঠিক বলতে গেলে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই শুরু হয়েছে বিপর্যয়। অর্থাৎ উক্ত সময় থেকেই পরিবেশের সবকিছুর মধ্যে আসছে দ্রুত পরিবর্তন।

তবু বলতে হয়, পরিবেশের সমতা যতটুকু বিনষ্ট হয়েছে তাতে একেবারে বিমর্ষ হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। তবে এমন একটি সন্ধিক্ষণে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। যেন বিপদসীমার একেবারে কাছে দাঁড়িয়েছি আমরা। কিংবা গলা সমান গভীর জলে দাঁড়িয়েছি, পা ফসকে দু'পা গেলেই নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন হই, জল-বায়ু-মাটি দূষণের কারণগুলি জ্ঞাত হই এবং যদি সতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে আমাদের এই অভ্যস্ত পরিবেশটাকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারবো। নিম্নে আমাদের পরিবেশ দূষণের কারণগুলি, আমাদের উপর দূষণের প্রভাব এবং প্রতিকার উল্লেখ করা গেল।

বায়ু দূষণ

আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। উপরে, পাশে, তলায় সর্বত্র বিরাজ করছে বায়ু। স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ বলে ওর উপস্থিতি আমরা টের পাই না।

বায়ু অনেকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। ওদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮০ এবং ২০ ভাগের মত। অপরাপর গ্যাসের পরিমাণ অতি নগণ্য।

বায়ু পৃথিবীর জীবের অপরিহার্য উপাদান। বায়ুর বিহনে মাত্র পাঁচ মিনিটও কেউ বাঁচতে পারে না। বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিত হয় শরীরে। অথচ প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় না। দেখা গেছে, একজন মানুষ সারাদিনে প্রায় ২২০০০ বার প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রায় ১৬ কিলোগ্রাম। অতএব বায়ু যথেষ্ট নির্মল হওয়ার প্রয়োজন এবং তাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থাকা চাই।

বাতাসে থাকে শতকরা ২০ ভাগের মত অক্সিজেন। ঐ পরিমাণই পৃথিবীর যে কোন জীবের পক্ষে যথেষ্ট। পরিমাণটা যদি বেড়ে উঠে তাহলে জীবের দেহে দহন ক্রিয়া দ্রুত হবে এবং পরমায়ু হবে ক্ষীণ। আর অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হবে। অর্থাৎ ঐ পরিমাণে অক্সিজেনে অভ্যস্ত পার্থিব জীব। হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে অসুবিধা ঘটবে। কিন্তু যদি কোন কারণে অবাঞ্ছিত কিছু কিছু গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি অহরহ বায়ুর সঙ্গে মিশতে থাকে তাহলে বায়ুতে অক্সিজেনের অনুপাত ঠিক থাকবে না। অপরপক্ষে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মত ভারী গ্যাস যদি বায়ুতে মিশ্রিত হয় তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অক্সিজেনকে অপসারিত করে নিজেই স্থান দখল করবে।

হ্রাস পাবে অক্সিজেনের পরিমাণ। এমন বায়ুকে আমরা নির্মল বলবো না। বায়ুর দূষণই বলবো। কেবলমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড নয়, উক্ত গ্যাস ব্যতীত অন্য যে কোন গ্যাস—যা জীবের পক্ষে ক্ষতিকর, অতি অল্প পরিমাণে বাতাসে স্থান পেলেও দূষণ হবে।

সাধারণত ঘন বসতি এলাকায় উনান থেকে, শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলি থেকে, মোটর-রেলগাড়ি-স্টীমার-বিমান প্রভৃতি থেকে নির্গত ধোঁয়া, ধূলিকণা ও গ্যাস বায়ুকে কলুষিত করে। ওদের উৎস ও ক্ষতিকর প্রভাবগুলি নিম্নে প্রদান করা হল।

(১) ধূলি, অন্যান্য কণিকা ও ধোঁয়া—

গ্রাম ও শহরের কাঁচা কিংবা কাঁকর পাতা পথ, নানা ধরনের কলকারখানা, খনি অঞ্চলে ও অন্যান্য জায়গায় খনন কার্য প্রভৃতি ধূলিকণার প্রধান প্রধান উৎস। সাধারণত পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলের বায়ুতে ধূলিকণা থাকে বেশী। হিসেবে দেখা গেছে বৃহত্তম কলিকাতা থেকে গড়ে প্রতিদিন আকাশে উঠছে ৬০০ টন ধূলিকণা। ওর সবটা সবসময় অবস্থান করতে পারছে না। বৃষ্টি হলে কিছুটা মাটিতে নেমে আসে। তবে যে পরিমাণ থেকে যায় তাও নগণ্য নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কলিকাতার উপরিস্থিত বায়ুর প্রতি ঘন মিটারে আছে ২৩৮ মাইক্রোগ্রাম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা।

পল্লী ও শহরাঞ্চলের বায়ুতে ধূলিকণা ছাড়াও অন্যান্য কণিকা থাকে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ফুলের পরাগরেণু, ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের রেণু, নানাপ্রকার রোগ জীবাণু, আগাছা ও অন্যান্য ছোট ছোট উদ্ভিদের বীজ, শেওলা-মস-ফার্ণ প্রভৃতির রেণু এবং নানা ধাতব ও অধাতব পদার্থের মৌলিক ও যৌগিক অণু।

ধূলিকণাই হোক অথবা অন্যান্য যে কোন কণা হোক, সবার আকার সমান নয়। খালি চোখে সবাইকে সনাক্তও করা যায় না। ওদের ব্যাস সাধারণত এক মিলিমিটারের পাঁচ হাজার ভাগের একভাগ থেকে এক মিলিমিটারের দশ ভাগের একভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সবাই ওরা

বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আগেও ভেসে বেড়াতো। বর্তমানে গাড়ী ও কলকারখানার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, উন্নত প্রথায় চাষবাস আরম্ভ হওয়ায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে থাকায়, আগাছার বংশ দ্রুতহারে বর্ধিত হতে থাকায়, যেখানে সেখানে হাঁস মুরগীর পোলট্রি ও গবাদি পশুর খামার গঠিত হওয়ায় বাতাসে নানা ধরনের কণিকার পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

বাতাসে ধূলিকণা তথা অন্যান্য যে কোন কণিকার বৃদ্ধি প্রধানত শ্বাসতন্ত্রের রোগ, সর্দি, কাশি, অ্যালার্জিঘটিত রোগ ইত্যাদির কারণ। শহর এবং শিল্পাঞ্চলের বায়ুতে ধূলাবালির সঙ্গে আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তূলা কিংবা পাটের আঁশ, পশুপাখীর লোম ও পালক বহুল পরিমাণে থাকে। ওদের প্রভাবেই শহরের মানুষেরা অ্যালার্জিতে বেশী ভোগেন।

বাতাসে সব রকমের কণিকার সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে চলেছে। বিশেষত শহরাঞ্চলের বায়ুতে। তাই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ যত বাড়বে (অবশ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও) ততই পৃথিবীর আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

কথাটা যে আদৌ অযৌক্তিক নয়, আমাদের কলিকাতা শহরের কথা চিন্তা করলেই ভালভাবে বোঝা যাবে। আজ থেকে বিশ বছর আগে শীতকালে কলিকাতায় শীতের যে প্রকোপ হতো এখন ততখানি নেই। এখন কোন কোন বছর সামান্য দশ বিশদিনও গরম পোষাক পরার প্রয়োজন হয় না। কার্তিক মাসের শেষেও ফ্যান খুলে ঘুমাতে হয়। তার কারণ বিশ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে কলিকাতার আকাশে ধূলিকণার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই প্রত্যক্ষ ফল পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

বাতাসে প্রলম্বিত কণিকাসমূহকে এরোসল বলা হয়। এরা বাড়তে থাকলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের নিম্নাঞ্চলে ধীরে ধীরে একটা আস্তরণ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যতই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ততই আস্তরণটা ক্রমশ পুরু হতে থাকবে। এরা সূর্যরশ্মির দ্বারা উত্তপ্ত হয় কিন্তু সহসা তাপ হারাতে পারে না। দিনের পর দিন স্তরটার তাপমাত্রা বাড়তেই

থাকবে। তারই প্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠও হয়ে উঠবে উত্তপ্ত। যেন একটা গরম আস্তরণের অন্তরালে মুখ ঢাকবে পৃথিবী। অনুরূপভাবে কিছুকাল চলতে থাকলে পৃথিবী এত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে তার মেরুদ্বয়ের সমূহ বরফও গলে যাবে। এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হবে পৃথিবীর বুকে। অর্থাৎ সেই আদিকালের মত জলমগ্ন হবে পৃথিবী। কয়েকটি পর্বত এবং কিছু মালভূমি অঞ্চল ছাড়া ডাঙা আর থাকবে না।

তাপমাত্রা যে বাড়ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বাংলার শহরাঞ্চলে কেন, পল্লীগ্রামেও শীতের প্রকোপ বেশ কমে এসেছে এবং গরমের পরিমাণ বাড়ছে। এর কারণ বাতাসে এরোসলের পরিমাণ বৃদ্ধি। এর জন্য সবাইকে সতর্ক হতে হবে এবং বাতাসে ধূলিকণা যাতে বাড়তে না পারে সেদিকে ভালভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

ধোঁয়ার উৎস সাধারণত কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানী। রান্নার কাজে প্রতিদিন খুব কম জ্বালানী ব্যবহার করা হয় না। পৃথিবীর জনসংখ্যার কথা চিন্তা করলে ওর পরিমাণটা যে কী ভয়াবহ তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। পৃথিবীতে বছরে খুব কম করে উত্তোলিত হচ্ছে ৭০০০ মিলিয়ন টন কয়লা এবং ১০০০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম। এদের সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘর-গৃহস্থালীর রান্নাবান্নার কাজে, কল-কারখানার ফার্নেসগুলিতে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এবং রেলগাড়ী, বিমান ও মোটর গাড়ী চালাতে। এই ধোঁয়ার উপাদানগুলি প্রধানত নানা ধরনের হাইড্রো-কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মন-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফার অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস এবং সীসা প্রভৃতি নানা বিষাক্ত পদার্থ। এদের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ধোঁয়ার আর একটি উৎস মানুষের ধূমপান। দৈনিক কত লক্ষ প্যাকেট যে সিগারেট পোড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার উপর আছে বিড়ি, তামাক, গাঁজা প্রভৃতির ধোঁয়া। এতে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাতাসে কার্বন-মন-অক্সাইড জমা পড়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির মূল কারণ ঐ ধোঁয়াই।

ধূলিকণা থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পারা যাবে যদি রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সরকার থেকে জনগণ সবারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত রাস্তার উপর। অপরদিকে কৃত্রিম বন সৃজনের মাধ্যমেও ধূলিমুক্ত হতে পারে। একমাত্র গাছের পাতাই ফিল্টারের মত ধূলিকে ছেঁকে নিতে পারে। ধোঁয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে জ্বালানী হিসাবে ধোঁয়াহীন জ্বালানী ব্যবহার ও সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো উচিত। আর ধূমপানের মত কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করলে অনেক উপকার হত পৃথিবীর। মনে রাখা উচিত যে, রান্নার কাজে গ্যাস উনান নিরাপদ নয়। গ্যাস উনান থেকে নির্গত হয় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। এদিক থেকে বৈদ্যুতিক উনান অনেক ভাল।

(২) কার্বন-ডাই-অক্সাইড—

প্রাকৃতিক নানা উৎস থেকে প্রতিদিন বিপুল আয়তনের কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করছে বায়ুমণ্ডলে। জীবজগৎ নিশ্বাসের সঙ্গে যে পরিমাণ উক্ত গ্যাসকে বাতাসে পরিত্যাগ করছে তার পরিমাণ বড় কম নয়। মাত্র একজন মানুষই একদিনে বাতাসকে উপহার দিচ্ছে প্রায় দু পাউণ্ডের মত কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে, প্রস্রবণ থেকে, জীব ও উদ্ভিদদেহের পচন থেকে, ভূ-পৃষ্ঠের চুনা-পাথর নানাবিধ অম্লের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং অন্যান্য অনেক কারণে বাতাসে জমা হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তার উপরও আছে অগ্নিকাণ্ড, তেল-কয়লা-কাঠ ইত্যাদির দহন।

এত উৎস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসছে বাতাসে অথচ পরি-মাণটা খুব বেশী বাড়তে পারছে না। সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রতিদিন উদ্ভিদেরা প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করে থাকে। তার উপর পৃথিবীপৃষ্ঠের নানা খনিজের দ্বারা শোষিত হয় এবং কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রাণী কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে আপন দেহের চারদিকে শক্ত খোলস গঠন করে থাকে। তাই সমতা বজায় থাকার ব্যবস্থা আছে। দেখা গেছে, বায়ুতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের তুলনায় এর পরিমাণ

নিতান্তই কম। শতকরা প্রায় ০·০৩ ভাগের মত। ওজন হিসাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে ২×১০^{১৫} কিগ্রার মত। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে যে পরিমাণ উক্ত গ্যাস বাতাসে এসে থাকে তার একটা বড় অংশই গ্রহণ করে উদ্ভিদজগৎ। অবশিষ্ট ব্যয় হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে। উদ্বৃত্ত বড় একটা থাকে না।

বর্তমানে সঙ্কট দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। বনভূমি ও লোকালয়ের গাছপালা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে চলেছে, শহরাঞ্চলে খালি ও পতিত জমিতে ঘরের পর ঘর উঠছে, আর প্রকৃতি আপন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে উদ্ভিদের যে দেহাবশেষগুলিকে ধারণ করে এসেছিল তাকে মানুষ উদ্ধার করে জ্বালানীর কাজে ব্যয় করছে। অতএব পতিত জমি থাকলো না, বন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর তারই পরোক্ষ ফল সমতা হ্রাস। অপরদিকে বিভিন্ন কলকারখানা, ইঞ্জিন এবং উনানে পুড়ছে দৈনিক কোটি কোটি টন কয়লা ও পেট্রোলিয়াম।

মানুষ আপন চাহিদাকে পূরণ করতে ক্রমান্বয়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণকে বাড়িয়ে চলেছে। এও এক মারণ যজ্ঞের সূচনা বলা যেতে পারে। তবে সুখের কথা বিবিধ পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা সে পরিমাণ হচ্ছে না। কতকগুলি সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, বিগত দশ বছরে বাতাসে ওর পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ০·০০১২ ভাগ। ঐ সামান্য বৃদ্ধি জীবের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বর্তমানে অনেক পণ্ডিতের মতে বিশ্বের উইপোকারাও প্রতিদিন বাতাসে $৪·৬ \times ১০^{১৬}$ গ্রামের মত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়াচ্ছে।

তবে আত্মতৃপ্তি লাভেরও কিছু নেই। এই একই হারে যদি বাড়তে থাকে তাহলে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে শতকরা ০·০৬ ভাগে এসে যাবে। তখন অনিবার্য কারণে বাতাসে শ্বাসযোগ্য অক্সিজেনের পরিমাণে দেখা দেবে ঘাটতি। শহরাঞ্চলে আবার এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। তখন হয়ত শহরের অধিবাসীদের প্রত্যেককে বহন করতে হবে অক্সিজেনের

সিলিণ্ডার। অফিসে, আদালতে, ঘরের মধ্যে, রাস্তায় সর্বত্রই অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা চিন্তা করতে গেলেই ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠে গায়ে।

পরিবেশটাও হয়ে উঠবে অতি উত্তপ্ত। একদিকে ধূলিকণা অপর দিকে কার্বন ডাই-অক্সাইড—সোনায় সোহাগার মত হবে। শীত বিদায় গ্রহণ করবে। ঋতুচক্রটা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বছরটার অধিকাংশ সময় সদম্ভে পদচারণা করবে গ্রীষ্ম। শীত হবে নির্বাসিত।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে যদি বর্তমানের দ্বিগুণের মত এসে যায় তাহলেও প্রভাবিত হবে জীব ও উদ্ভিদজগৎ। বলাবাহুল্য, উদ্ভিদের উন্নতি হবে আর জীব অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। অথবা কম অক্সিজেনের পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত জীবের উন্নতি হবে। মানুষ জাতটার উঠবে নাভিশ্বাস। তাপবৃদ্ধির উক্ত ঘটনাকে পণ্ডিতেরা বলেছেন “গ্রীন হাউস এফেক্ট”। এই অবস্থায় মেরুদেশের এবং কিছু কিছু পর্বতশীর্ষের বরফও গলে যাবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, বাতাসে যে মাত্র ০·০৩ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে তা যদি না থাকতো তাহলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা অন্তত ৪০° সেন্টিগ্রেড কমে যেতো।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমানে কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে স্থির করেছেন, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আজকের তুলনায় যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ফসলের উৎপাদন প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের শ্বাসযোগ্য অক্সিজেনের কিছুটা ঘাটতি ঘটলেও অভিশাপ আশীর্বাদরূপে দেখা দেবে।

এই ভয়াবহ পরিবেশ অবশ্য হঠাৎ আসবে না। আনন্দের কথা, মানুষ ভূগর্ভে সঞ্চিত জ্বালানীর পরিমাণ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। উঠে পড়ে লেগেছে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সফলকাম হবে মানুষ।

তবে এখানেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে অপরিসীম বেদনা। আমরা যদি আমাদের আমলে ভূগর্ভের সমূহ সম্পদকে খরচ করে গেলাম, তাহলে

আমাদের বংশধরদের জন্য রেখে গেলাম কি ? নিজে কাটিয়ে গেলাম সুখভোগে আর সন্তানকে ডুবিয়ে দিয়ে গেলাম দারিদ্র্যে। মনুষ্যত্বের গৌরব কোথায় ? সাধারণ পশু পাখীর মতোই সঞ্চয় না করে কেবল নিঃশেষ করে ফেলার প্রয়াস ?

জ্বালানীকে নিঃশেষ না করার জন্যই জলবিদ্যুৎ ও পরমাণুশক্তির ব্যবহার। কিন্তু চাহিদা এমন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে যে, ওদের দ্বারাও যেন সম্ভব হচ্ছে না। তাই জ্বালানী খরচ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হচ্ছে। অপরপক্ষে পারমাণবিক জ্বালানীও অফুরন্ত নয়। এই কারণে বিকল্প শক্তির খোঁজ এখনই করতে হবে, সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা করতে হবে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে জীবজন্তু এমনকি মানুষের মলমূত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে হবে।

জীবজন্তুর মলমূত্র বায়োমাস নামে খ্যাত। আমাদের ভারতেই গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। ওদের গোবরকে একত্রিত করলে দৈনিক প্রায় দু লক্ষ টন হবে। অথচ এগুলিকে ঘুঁটের আকারে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। তাতে অপচয় হয় বহু শক্তির। যদি গোবর এবং জনবহুল এলাকার মানুষের মলকে কাজে লাগিয়ে গ্যাস তৈরি করা যেতো তাহলে দৈনিক হাজার হাজার টন কয়লা ও খনিজ তেলের খরচ কমতো। ফলে লাভ হতো এই যে, বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমা পড়ছে তার পরিমাণ কমতো এবং বছরে প্রায় এক কোটি টন জ্বালানীর সাশ্রয় হতো। একটা দেশের পক্ষে এই সাশ্রয়টা বড় কম নয়। ওতে আমাদের উত্তরাধিকারীরা দুদিক থেকে লাভবান হতো। প্রথমত তাদের পরিবেশটা কিছুটা শুদ্ধ থাকতো এবং হাতের কাছে সম্পদও পেতো।

(৩) সালফার-ডাই-অক্সাইড—

বাতাসে সালফার-ডাই-অক্সাইডের প্রভাব জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বায়ুতে ওর থাকার প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই। অথচ

আমরা আমাদের বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাতাসে উক্ত গ্যাসটিকে অহরহ জমা করে যাচ্ছি। পেট্রোলিয়াম পরিশোধনাগার, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের কারখানা থেকে প্রতিদিন উত্থিত হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। তাছাড়া অতি স্বল্প পরিমাণে খনিতে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে সালফার বা গন্ধক মিশে থাকে বলে যেখানেই কয়লা ও খনিজ তেলকে পোড়ানো হয় সেইখানেই উৎপন্ন হয় কিছু না কিছু সালফার-ডাই-অক্সাইড। গন্ধকযুক্ত আকরিক যথা জিঙ্ক ব্লেণ্ড, কপার পাইরাইটিস, গেলেনা ইত্যাদি থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে গেলেও গ্যাসটি মুক্ত হয়। যদিও কাজে লাগানো হয়ে থাকে তবু বাতাসে বড় কম যায় না। তাই ক্রমশই পৃথিবীর বায়ুতে গ্যাসটির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। গ্যাসটি আবার বায়ুর চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ ভারী বলে যে অঞ্চলে মুক্ত হয় সেই অঞ্চলটিকে দূষিত করে অধিক পরিমাণে।

বাতাসে সালফার-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ালে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। কিছুকাল উক্ত পরিবেশে থাকলে শ্বাসযন্ত্রের, বুকের ও গলার নানাপ্রকার রোগ হতে পারে। এমনকি ক্যানসার হওয়াও অসম্ভব নয়।

সালফার-ডাই-অক্সাইডের আরও কতকগুলি ক্ষতিকর প্রভাব আছে। প্রথমত, গ্যাসটি মার্বেল পাথর ও বেলে পাথরের উপর প্রচণ্ড ভাবে ক্রিয়া করে বলে যে-সব অঞ্চলে কারখানা থেকে মুক্ত হয় সে-সব অঞ্চলে মন্দির মসজিদ প্রভৃতি পুরাকীর্তিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বিতীয়ত, সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের ও জলীয়-বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও সালফিউরাস অ্যাসিড নামে দুটি অম্ল গঠন করে এবং বাতাসেই অবস্থান করে। অম্ল দুটি জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। তাই বৃষ্টি হলে বর্ষার জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে মাটিতে নামে। একে বলা হয় আম্লিক বৃষ্টি। এর ফলে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, জমির উর্বরতা হ্রাস পায়, গাছ-গাছড়ার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বহু জলচর জীবের মৃত্যুর কারণ হয়।

আজকের দিনে বনভূমি হ্রাস পেতে থাকায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের

কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, মাটির ক্ষয় নিবারণের জন্য এবং সুবৃষ্টির আশায় কৃত্রিম বনের সৃজন করে চলেছি অথচ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছি সালফার-ডাই-অক্সাইডের মত অত্যন্ত ক্ষতিকর গ্যাসকে। অর্থাৎ পরিকল্পনার মূলে পরিকল্পনাকে নস্যাতের পরিকল্পনা! সরষের মধ্যে যেন ভূত। শিল্পাঞ্চলের অ্যাসিড বৃষ্টি শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকেও যেতে হচ্ছে স্থলভাগের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে। বিস্তীর্ণ এলাকাকে করে অ্যাসিডযুক্ত এবং গাছপালারও করে যথেষ্ট ক্ষতি।

উক্ত কারণে কারখানাগুলি থেকে যাতে সালফার-ডাই-অক্সাইড মুক্ত হতে না পারে কিংবা অতি অল্প মুক্ত হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। শিল্প থেকে উপজাত হিসাবে যে সালফার-ডাই-অক্সাইডকে পাওয়া যায় তাকে কাজে লাগাবার সুষ্ঠু পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক দুর্ভাবনা থেকে মুক্তিলাভ করবে মানুষ।

(৪) নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড—

আজকাল আমরা বড় একটা হাঁটতে চাই না। এক মাইল হাঁটার পরিশ্রম লাঘব করতে এক ঘণ্টা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করি না। তাইতো আমাদের সুবিধা করতে দিনে দিনে মোটর গাড়ীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জনবহুল এলাকায় গাড়ীগুলো পিঁপড়ের সারিকেও হার মানায়।

একদিকে গাড়ী মোটর অপরদিকে ছত্রাকদের কলোনির মত যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠছে ছোট বড় অজস্র কলকারখানা। কোথাও প্লাস্টিক কোথাও নানা রকমের অ্যাসিড, কোথাও বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি কত হরেক রকমের পদার্থ তৈরি হচ্ছে। যার ফলে বায়ুতেও জমা পড়ছে অবাঞ্ছিত কতকগুলো নাইট্রোজেনের অক্সাইড। তাদের মধ্যে আবার চরম ক্ষতিকর নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড।

প্রমাণিত হয়েছে, বাতাসে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলির মোট

পরিমাণ দশ লক্ষ ভাগের একভাগ থাকলে ক্ষতির সম্ভাবনা আদৌ নেই। ঐ পরিমাণ বাড়তে আরম্ভ করলেই জীব ও উদ্ভিদ উভয়েই প্রভাবিত হবে এবং প্রত্যেকের শরীরে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। শহরাঞ্চলে মাঝে মাঝে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় তার মূল কারণও নাইট্রোজেনের বিবিধ অক্সাইড।

নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি বিষাক্তও বটে। আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ফলে বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশের অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত হয়। ওরা বাতাসে অবস্থান করে। বৃষ্টির সময় বৃষ্টি জলের সঙ্গে ক্রিয়ায় গঠন করে নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড। উক্ত অ্যাসিডদ্বয় জলের সঙ্গে তখন নেমে আসে ভূ-পৃষ্ঠে। মাটিতে বসবাসকারী উপকারী ব্যাক্টিরিয়ারা সেগুলোকে উদ্ভিদের খাদ্যে রূপান্তরিত করে দেয়।

ঐ উপায়ে বাতাসে আপনা হতে যে নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি তৈরি হয় তার একটা সমতা বজায় থাকে। উৎপাদনের হার কম বলে বৃষ্টির জলও ততটা আম্লিক হতে পারে না। কিন্তু কারখানা এবং মোটরগাড়ী থেকে যে পরিমাণ ধোঁয়া ও গ্যাস প্রতিদিন বাতাসে প্রবেশ করছে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে যাচ্ছে নাইট্রোজেনের প্রধান দুটি অক্সাইড। এরা অহরহ বাতাসে যাচ্ছে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বায়ুকে দূষিত করছে। পরিমাণটা মাঝে মাঝে এত বেশী হয়ে পড়ে যে, বৃষ্টিও অ্যাসিড যুক্ত হয়ে পড়ে।

বৃষ্টির জল অ্যাসিড যুক্ত কিনা স্থির করা হয় ওর Ph মাত্রা নির্ণয় করে। সাধারণত বিশুদ্ধ জলের Ph মাত্রা ৭। ৭ অপেক্ষা কম হলেই অ্যাসিডের প্রভাব বুঝতে হবে। মাত্রাটা কমতে কমতে ৫·৬ তে এসে গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ৫·৬ এর কম হলেই জীব ও উদ্ভিদ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পাঞ্চলে অনেক সময় এই অ্যাসিড যুক্ত বর্ষণ হয়। ফলে দেখা গেছে, উদ্ভিদ ও জলচর প্রাণীরা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর প্রভাবে।

তীব্রতম অম্লবৃষ্টির ঘটনা নিউইয়র্ক শহরে (বৃষ্টিজলের PH মাত্রা ২·৪) এবং বোম্বাইতে (বৃষ্টিজলের PH মাত্রা ৩·৫) দেখা গেছে। বহু জায়গার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে অম্লবৃষ্টির প্রভাবে। আরও মজার কথা, নির্গত গ্যাস কারখানা থেকে শত শত মাইল দূরেও অম্লবৃষ্টি ঘটাচ্ছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলের গ্যাস কানাডায় এবং বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর শিল্পাঞ্চলের গ্যাস নরওয়ে ও সুইডেনে অম্লবৃষ্টি ঘটাচ্ছে। এর প্রভাবে নিউইয়র্কের ২০০, কানাডার ৪০০০, সুইডেনের ১৫০০ এবং নরওয়ের ৪০০০ পুকুর মৎস্যহীন। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩০ শতাংশ বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত।

মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়ার আরও সব মারাত্মক প্রভাব আছে। ওদের ধোঁয়া থেকে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন অক্সাইড-গুলি নির্গত হয় না, মুক্ত হয় অলিফিন জাতীয় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যে হারে বাস, লরি, ট্যাক্সি, টেম্পো, মোটরসাইকেল ইত্যাদির সংখ্যা এ.পি. সিরিজের মত বেড়ে চলেছে তাতে কী পরিমাণ দূষিত পদার্থ মুক্ত হচ্ছে, তা সহজে অনুমান করা যায়। অথচ না বাড়িয়েও উপায় নেই। সভ্যতার সঙ্কট এসে যাবে।

এবার ধোঁয়াশার কথায় আসা যাক। শীতকালে সূর্যাস্তের পর মাঝে মাঝে কোন কোন শহরের চারদিকে ঘন কুজ্ঝটিকা নেমে আসে। কুয়াশা সাধারণত বেলা বাড়লে ছেড়ে যায়। কিন্তু এ কুয়াশা কিছুতেই পাতলা হওয়ার নাম করে না। ফলে বিপর্যস্ত হয় নাগরিক জীবন। এর মূলেও আছে অসংখ্য গাড়ী মোটর ও কলকারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশ্রিত নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি।

আমরা জানি, বাতাসের একটি উপাদান অক্সিজেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও কিছু কিছু সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। ঐ রশ্মি বায়ুর অক্সিজেনকে ওজোনে রূপান্তরিত করছে। যদিও পরিমাণে অত্যন্ত কম। অপরদিকে কলকারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কালে কিছু কিছু ওজোন উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেগুলিও স্থান লাভ করছে বায়ুতে। তাই উপরে ওজোনের স্তর

থাকলেও বায়ুতে এমনিই অবস্থান করছে অল্পস্বল্প ওজোন। কলকারখানা গাড়ী মোটর ইত্যাদি থেকে মুক্ত নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি এবং ওজোন আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠন করে পারক্সাসিল নাইট্রেট নামের একটি যৌগ। ঐ পারক্সাসিল নাইট্রেটই ধোঁয়াশার উপাদান। এটি তৈরি হলে মাটি থেকে অল্প উচ্চতায় আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে এমন একটি স্তর তৈরি করে, যার ফলে নিচের দূষিত বায়ু তাকে ভেদ করে উপরে উঠতে পারে না। আর ধোঁয়াশাও ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে এবং একটা উল্টানো উষ্ণতার স্তর গঠিত হয়।

ধোঁয়াশার প্রভাবে দিবাভাগের তাপমাত্রা কমতে থাকে, বাতাসের বেগ হ্রাস পায়, নিয়মিত বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটায়। তদুপরি অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় বলে নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করে চোখের রোগ ফুসফুসের ক্ষত, ক্যান্সার ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে কবলিত হতে হয় অনেককে। ১৯৫২ সালে লণ্ডন শহরে ধোঁয়াশার জন্য প্রাণ হারিয়েছে ৫০০০ মানুষ।

দেখা যাচ্ছে, জনবহুল এলাকাগুলিতে কলকারখানা ও গাড়ী মোটরের সংখ্যা যা বেড়েছে তা কমানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে এরপর আর একটিও নয়। কলিকাতা শহরের পাতাল রেল সম্বন্ধে অনেককে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করতে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা অপব্যয় ও সাময়িক অসুবিধাটা দেখেন কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফলের কথা চিন্তা করেন না। গাড়ী-মোটরের সংখ্যা বৃদ্ধি আরও যে কত ক্ষতি করে থাকে, সে কথা পরেই আলোচনা করা যাচ্ছে।

(৫) অন্যান্য গ্যাস—

অন্যান্য যে সমস্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে তাদের মধ্যে প্রধান দুটি হলো কার্বন-মন-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড। এদের দুইটি উৎপন্ন হচ্ছে মোটরগাড়ী ও কলকারখানা থেকে।

প্রথমে কার্বন-মন-অক্সাইডের কথা ধরা যাক। গ্যাসটি অতিমাত্রায়

বিষাক্ত। এর প্রভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মৃত্যুও পর্যন্ত হয়ে থাকে। অথচ গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে নানা উপায়ে। যেহেতু কয়লার দহনের সময় বায়ুর পরিমাণ কম হলে কার্বন-মন-অক্সাইড গঠিত হয় তাই যেখানে কয়লা ও খনিজ তেলের দহন হয় সেইখানেই কিছু না কিছু উৎপন্ন হয়। সৌভাগ্য যে, গ্যাসটি নিজেই নীলাভ শিখায় জ্বলতে থাকে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গঠন করে নেয়। তবে মুক্তও হয় কিছু কিছু।

কার্বন মন-অক্সাইডের প্রধান উৎস পুরাতন মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন ও অন্যান্য যে কোন পুরানো ইঞ্জিন। তার উপর আছে ধাতু নিষ্কাশনের বৃহদায়তন পদ্ধতিগুলি। বিশেষ করে মারুত চুল্লীগুলি থেকে মুক্ত হয় বেশ কিছু কার্বন-মন-অক্সাইড। সিগারেটের পরিত্যক্ত ধোঁয়া প্রচুর কার্বন-মন-অক্সাইড ছড়াচ্ছে। কাজেকর্মে আমেজ আনার নাম করে আমরা যে মূর্খতার পরিচয় প্রদান করি তার কোন তুলনাই হয় না। জেনে শুনে উক্ত বিষ পান করি, নিজে মরি এবং অপরকেও মারি। অর্থাৎ ধূমপানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডই চলছে।

আমরা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি তাতে ব্লাস্ট-ফার্নেসকে বন্ধ করা যায় না। আবার উক্ত উপায়ে যে পরিমাণ কার্বন-মন-অক্সাইড বাতাসে আসে তার চেয়ে ঢের বেশী আসে পুরাতন ইঞ্জিন থেকে। যদি পুরাতন ইঞ্জিনকে একেবারে বাতিল করার নিয়ম প্রযোজ্য হয় তাহলে গ্যাসটির প্রভাব থেকে অনেকখানি যুক্ত থাকবে বায়ু।

অপর গ্যাস তথা হাইড্রোজেন সালফাইড বাতাসে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে পেট্রোলিয়াম শিল্প, রঙের কারখানা, রাসায়নিক গবেষণাগার, চামড়ার কারখানা ইত্যাদি থেকে। পচা ডিমের গন্ধযুক্ত এই গ্যাসটিও নীলাভ শিখায় জ্বলে। এর ক্ষতিকর প্রভাবও আছে। যদিও বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্যাসটিকে ব্যবহার না করলে এক মুহূর্তও চলে না। অথচ তারা জানে উজ্জ্বল ধাতব পদার্থের উপর গ্যাসটির

ক্রিয়ায় কালো আস্তরণ গঠিত হয়। তাই হাতঘড়িকে খুলে রাখে তারা।

কেবল চক্‌চকে ধাতব পদার্থ নয়, মানুষেরও ক্ষতি করে। দীর্ঘক্ষণ উক্ত গ্যাসটিকে নিয়ে মেতে থাকলে মাথার যন্ত্রণা হয়। রসায়নাগারে ব্যবহার না করে উপায় নেই। তাছাড়া সেখানে সতর্কতা অবলম্বনেরও অবকাশ রয়েছে। অপরপক্ষে নানা উৎস থেকে বায়ুতে গ্যাসটিকে পাঠালে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। এর প্রভাবে শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ রোগ হয়। বায়ুমণ্ডলে ওর পরিমাণ বাড়লে কোনো উজ্জ্বল ধাতব পদার্থ বেশীদিন তার ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে পারবে না। সালফার-ডাই-অক্সাইডের মত এক্ষেত্রেও যদি কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা যায় তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মির সহায়তায় নাইট্রোজেনের অক্সাইড-গুলোর সাথে হাইড্রো-কার্বনের ক্রিয়ায় তৈরি হয় পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট বা PAN এবং ওজোন। দুটিই উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষে বাধা দান করে। এবং মানুষের ফুসফুস, চোখ, ত্বক ইত্যাদির উপর প্রতিক্রিয়া করে। কোক-ওভেন, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি থেকে প্রচুর PAN নির্গত হয়।

(৬) বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের উপর আঘাত—

আজ সবারই জানা হয়ে গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের একটা নির্দিষ্ট স্তরে অবস্থিত ওজোনের স্তর পৃথিবীর রক্ষাকবচস্বরূপ। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সর্বনিম্নস্তর ট্রপোস্ফিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত, পরবর্তী ৫০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার, ১০০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত মেসোস্ফিয়ার, তারপরে থার্মো-স্ফিয়ার, ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারের কিছু অংশ জুড়ে অর্থাৎ উর্ধ্বে ২০ থেকে ৮০ কি. মি. উচ্চতার মধ্যে আছে ওজোনের স্তর। স্তরটি আবার ২০ থেকে ৩০ কি. মি.-র মধ্যে সর্বাধিক ঘন এবং পৃথিবীকে যেন ছাতার মত আড়াল করে রেখেছে। ওর দ্বারা সূর্য থেকে আগত

অধিকাংশ অতিবেগুনী রশ্মি শোষিত হয়ে যায়।

আদিম পৃথিবীর বায়ুস্তরে এই ওজোন আদৌ ছিল না। তাই ছিল না এত জীব ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্য। পরবর্তীকালে বায়ুতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের আগমন হতে থাকলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গঠিত হয় ওজোনের স্তর। আর তখনই ঐ ওজোন আপন স্রষ্টা তথা অতি বেগুনি রশ্মিকে করলো প্রতিহত। পুরাণের সেই ভস্মাসুর অথবা গাছের ডালে আশ্রয়কারী স্বর্ণলতাদের মত।

প্রকৃতপক্ষে বায়ুস্তরে ওজোনের সুদৃঢ় স্তর গঠিত হতেই পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ এমন অপ্রতিহত প্রভাবে বংশবিস্তার করে চলেছে এবং বিবর্তনের ধারায় এমন বৈচিত্র্যও এনেছে। যতদিন উক্ত স্তরটি সুগঠিত থাকবে ততদিন সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলির প্রভাব থাকবে অতি সামান্যই। যাকে অতিক্রম করতে একমাত্র অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদ ছাড়া কারও অসুবিধা হবে না বরং অতি অল্প পরিমাণে আসায় উন্নত জীবগোষ্ঠীর সুবিধাই হয়েছে বেশী। কিন্তু আজ আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যেমন সবকিছুকে বিপর্যস্ত করে তুলছি, তেমনই আমাদের উদ্যত খড়্গকে এগিয়ে দিয়েছি ঐ দূর ওজোন স্তরটার দিকে। অর্থাৎ ঐ ওজোনদের মতই স্রষ্টা তথা রক্ষকের বুকে আঘাতের পর আঘাত হানছি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য।

ধ্বংসের আয়োজন আমরা কোথায় কম করছি? বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে পাঠাচ্ছি শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান, কলকারখানা ও গাড়ীর ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের যত্রতত্র ঘটাচ্ছি পারমাণবিক বিস্ফোরণ, মাটি থেকে উপরে উৎক্ষেপন করছি অপরিমিত নাইট্রিক অক্সাইড, নানা হাইড্রোকার্বন ও ক্লোরিন গ্যাস। সপ্তরথীর বেড়াজালে ক্ষতবিক্ষত অভিমন্যুর দেহখানির মত আজকের ওজোনের স্তর।

স্মরণ রাখতে হবে যে, নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনের স্তরকে যতখানি বিধ্বস্ত করে তার চেয়ে অনেক বেশী করে ক্লোরিন গ্যাস। ওর বিধ্বংসী ক্ষমতা নাইট্রিক অক্সাইডের প্রায় ছ'গুণ। কৃষিক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে

ব্যবহার করছি কীটনাশক ডি. ডি. টি ও অন্যান্য ক্লোরিনের যৌগ, আরামের জন্য ক্লোরোকার্বন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করছি, যেখানে সেখানে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করছি আর বায়ুতে পাঠাচ্ছি পর্যাপ্ত ক্লোরিন গ্যাসকে।

একদিকে দানব নাইট্রিক অক্সাইড অপরদিকে নাইট্রিক অক্সাইড অপেক্ষা ৬ গুণ ক্ষতিকর মহাদানব ক্লোরিন ধ্বংসযজ্ঞে প্রবৃত্ত! উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে চলেছে ওজোনের স্তরকে। তাই এখনই ক্ষতি হয়েছে পৃথিবীর সেই কঠিন বর্মটি। ফলে পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে নেমে আসছে। আরও যদি ক্ষতি হতে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীপৃষ্ঠে অতি বেগুনি রশ্মির বন্যা আসবে। ভেসে যাবে জীব ও উদ্ভিদ। যারা দৃঢ় অবলম্বনকে আঁকড়ে রেখে বাঁচার চেষ্টা করবে তারাও দীর্ঘায়ু হতে পারবে না। আক্রমণ করবে ক্যানসারের মত অতি ভয়ঙ্কর সব রোগ। ওরা নিজেরা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বংশানুক্রমে চলতে থাকবে মারাত্মক রোগ ব্যাধির আক্রমণ। তার ফল হবে এই যে, এক রুগ্ন সমাজ নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য দিন গণনা করতে থাকবে। পরিশেষে প্রাকৃতিক আবহাওয়া যখন প্রকৃতির নিজেরই নিয়মে শুদ্ধ হবে তখন প্রবল হয়ে উঠবে আর একদল কিংবা ফিরে আসবে সেই অরণ্য।

আমাদের সভ্যতা আজ যে পর্যায়ে এসে গেছে সেই পর্যায়ে অরণ্যে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। বাতুলতা কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া এবং সুখ সুবিধা বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা করা। তবে ইচ্ছে করলে আমরা পারমাণবিক বিস্ফোরণকে বন্ধ করতে পারি, দ্রুতগামী বিমানদের আকাশে ওড়ানো সীমিত করতে পারি, ডি. ডি. টি প্রভৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারি। অপরদিকে কলকারখানা থেকে মুক্ত নাইট্রিক অক্সাইডকে শুদ্ধ করতে পারি, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ও বায়োমাস ইত্যাদিকে ব্যবহার করে মুক্ত নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করতে পারি।

হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানুষ সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবে। কিছু কিছু মোটরগাড়ীও চলবে সৌরশক্তির সাহায্যে। সাগরের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেও জ্বালানীর ব্যবহার কমাবে। তখন বাতাসে অবাঞ্ছিত গ্যাসের পরিমাণ বাড়ার বিশেষ সুযোগ পাবে না। কিন্তু এই কথা ভেবে এখনই আমরা যতখুশি বায়ুকে দূষিত করবো—এমন মানসিকতা যেন কারও না আসে। ভবিষ্যতে সুখ আসবে এই ভেবে যারা পরিতৃপ্ত হতে চায় তারা শূন্যে সৌধ নির্মাণ করে বলে আমরা মনে করি। তার ফল যে কত ক্ষতিকর ব্যক্তিগত জীবনে সে প্রমাণ আমরা প্রায় সবাই হাতে নাতে পেয়ে থাকি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে এগিয়ে না গিয়ে শুধু স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে, স্বপ্নভঙ্গের বিলম্ব হয় না। আর ব্যর্থ মানুষ তখনই অদৃষ্টের দোহাই পাড়ে।

আজ যে স্বপ্ন নিয়ে শক্তিশালা দেশগুলি মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে, বিশ্বমাঝে আপন ক্ষমতা জাহিরের জন্য প্রবলভাবে প্রয়াস চালাচ্ছে তারা যদি এখনই সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে যে জন্য তাদের এত উদ্যোগ আয়োজন তার সমাধি ঘটতে কতক্ষণ! ভস্মাসুরের মত সেও ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

[ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মে উর্ধ্বাকাশের অতি অল্প ওজোন বায়ুমণ্ডলের সর্ব নিম্নস্তরে প্রবেশ করে। তার উপর মাটি থেকে প্রেরিত নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড আলোক রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি করছে নাইট্রিক অক্সাইড ও পারমাণবিক অক্সিজেন। ঐ অক্সিজেন ও বাতাসের অক্সিজেন উভয়ে মিলে গঠন করে পুনরায় ওজোন। ফলে দুদিক থেকেই বাতাসে ওজোনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে বাতাসে ওর পরিমাণ এক কোটি ভাগে একভাগের একটু বেশী হলেই বিপদ আসবে।]

জল দূষণ

বায়ুর পরেই আসে জল দূষণ। বায়ুর মত জলও আমাদের অপরিহার্য। জলকে শুধু পান করি না, আমাদের প্রয়োজনের সর্বক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত জল। কতদিক থেকে আমরা জলকে ব্যবহার করে থাকি ? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জল আমাদের সহচর। বেশীক্ষণ জলপান না করলেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই জলের আর এক নাম জীবন।

পৃথিবীর জলভাগ দুটি ভাগে বিভক্ত। লোনাজল ও মিঠাজল। সাগরের জল এবং কিছু কিছু হ্রদের জল লোনা। নদী, খাল, বিল, পুকুর এবং কিছু হ্রদের জল মিঠা। লোনাজল পানের অযোগ্য। তাছাড়া কলকারখানা ইত্যাদিতেও লোনাজল ব্যবহার করা যায় না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মিঠাজলেরই প্রয়োজন হয়।

মিঠাজলের উৎস বৃষ্টি। বৃষ্টির জল পুকুর ও নদীতে জমে। নদী ওদের পৌঁছে দেয় সাগরে কিংবা হ্রদে। সাগর জলের সঙ্গে মিশলেই লোনা হয়ে যায়।

নদী কেবল বৃষ্টির জলকে বহন করে না, তুষার গলা জলকেও বহে নিয়ে আসে। তাই অধিকাংশ নদীতে বারমাস জল থাকে। এই জলে মালিন্য থাকে না। সত্যই বড় পবিত্র। যুগে যুগে তাই নদী প্রভাবিত করে এসেছে মানুষকে। নদী মাতৃস্বরূপিনীও। সভ্যতার সেই উষালগ্নেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল নদীর গুরুত্ব। সেই কারণেই তারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল বিভিন্ন নদীর তীরভূমিতে। এখানে বন্যজন্তুর আক্রমণ ছিল না, সাপ খোপের প্রাদুর্ভাবও তত ছিল না, অল্পায়াসে প্রচুর মাছ-কাঁকড়া পাওয়া যেতো, কম মেহনতে উৎপন্ন হতো প্রচুর ফসল। তার উপর পানীয় জলের এমন উৎকৃষ্ট উৎস আর কোথায় ছিল ? অপর পক্ষে নদীপথে যাতায়াতেরও ছিল যথেষ্ট সুবিধা।

তাই একদিন নদী মাত্রই ছিল মানুষের কাছে পবিত্র। পান ও অবগাহনকে পুণ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর মনে করা হতো। এখনও সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। রাইন, জর্ডন, গঙ্গা, গোদাবরী প্রভৃতি কত নদীতে মানুষ পুণ্যস্নান করে।

কিন্তু সে-দিন আর নেই। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি নদীর জল দূষিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ মাতৃদগ্ধও আজ বিষাক্ত। এই দূষণের শুরু সেই প্রথম থেকে—এক কথায় মানুষ যেদিন বসতি স্থাপন করেছিল নদীর তীরে, সেইদিন থেকে। কিন্তু সেদিন দূষণের পরিমাণটা নিতান্ত তুচ্ছই ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ ?

জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। নদীর তীরগুলিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নদীবন্দর ও কলকারখানা। নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আবর্জনা। সেচের জন্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নদীর মুখে আবার বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। নদী হারিয়ে ফেলছে তার স্বাভাবিক গতিপথকে। তাই নদীর জল বিষাক্ত থেকে বিষাক্ততর হয়ে উঠছে। আবার যেহেতু নদীগুলি তার জলকে সাগরে পৌঁছে দিয়ে আসে তাই আবর্জনা সাগরেও জমছে এবং সাগর জলকেও দূষিত করছে।

সরাসরি সাগর তীরেও গড়ে উঠেছে কত বন্দর, কত কারখানা, কত জনবহুল শহর। তাই সেখানেও জমছে মানবের তৈরি ক্লেদ। এই-ভাবে ক্ষুদ্র জলভাগ থেকে বৃহত্তম জলভাগ পর্যন্ত কোনকিছুকে মানুষ অপবিত্র করতে বাদ দেয়নি। সমীক্ষা গ্রহণ করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর উপরিভাগের অধিকাংশ হ্রদ আজ দূষিত। দূষিত মিসিসিপির মত পৃথিবীর বৃহত্তম নদী, দূষিত ভূমধ্যসাগর বাল্টিক সাগরের মত সুবৃহৎ জলভাগ।

বদ্ধ জলাশয় এবং হ্রদের জলকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা নানা কারণে দূষিত ও জীবাণুযুক্ত করে ফেলি। সূর্যের আলো, বায়ুর প্রবাহ কিছুটা শুদ্ধ করে দেয় এবং বর্তমানের সচেতন মানুষও নানা উপায়ে তার বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু নদী কিংবা সাগরের জল দূষিত হলে তার বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনা ভয়ানক কষ্টকর।

এক-একটা রাষ্ট্রেরও সাধ্যের বাহিরে বলা যেতে পারে। অথচ কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে দূষণের পরিমাণ অনেক কম হতো। যেমনটি করেছে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু কিছু দেশ। তবে এও সত্য যে, ওদের কলকারখানার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য অন্যান্য দেশ থেকে ওদের জলভাগ বেশী দূষিত হচ্ছে। সুখের কথা, ভারতও কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, নদী ও সাগর জল দূষণের মূলে আছে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কলকারখানা। নিম্নে প্রধান প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করা হলো।

(১) নদী বাহিত ময়লা—

প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, নদী তার জলকে পরিশুদ্ধ করার কতকগুলো নিজস্ব ক্ষমতা রাখে। যেমন, (১) নদীর বিশাল জলরাশিতে দূষিত পদার্থ পড়লে জলে গুলে অনেকখানি পাতলা হয়ে পড়ে, (২) প্রবহমান জলের স্রোতে কিছু থিতিয়ে পড়ে, (৩) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঙ্গে জারণে কোন কোন উপাদান আকারে বেড়ে উঠে এবং থিতিয়ে পড়ে, (৪) বিজারণ ক্রিয়ায় কিছু কিছু নষ্ট হয়, (৫) বেশীরভাগ নষ্ট হয় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে।

কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে পরিশুদ্ধ হতে হলে নদীর জলকে অনেক দূর প্রবাহিত হয়ে ৪টি স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্তরগুলি অতিক্রম করে প্রায় ৫০ মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর। এর মধ্যে পুনরায় দূষক পদার্থ যুক্ত হলে স্বাভাবিক ক্ষমতা কার্যকরী হবে না। অর্থাৎ দূষণ মুক্ত হতে না হতে পুনরায় শুরু হবে দূষণ।

আজকাল প্রবহমান নদী স্রোতের ৫০ মাইলের ভেতরে বহু কল-কারখানা ও বহু ঘনবসতি অঞ্চল আছে এবং শাখানদীগুলিও ঢালছে দূষক পদার্থ। তাই নদী আজ ব্যর্থতার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে।

সমুদ্রের তীরে এবং দেশের অভ্যন্তরে নদীর তীরগুলিতেই গড়ে

উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদগুলি। লক্ষ লক্ষ লোকের পরিত্যক্ত ময়লা ও আবর্জনা নর্দমার দ্বারা বাহিত হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে, নয়ত নদীতে। যেগুলি নদীতে পড়ছে সেগুলিও নদীর দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হচ্ছে। নদী ও সমুদ্র দুই-ই দূষিত হচ্ছে এদের প্রভাবে।

নর্দমার আবর্জনা ও নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ যখন বাহিত হয় তখন এক ধরনের জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ঐ জীবাণুই আবর্জনাকে পচতে সাহায্য করে এবং তারই প্রভাবে কালো পাঁকের সৃষ্টি হয়। এদিক থেকে এই জাতীয় জীবাণুরা কিছুটা উপকার করে বটে। কেননা আবর্জনাকে পচে গলে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্ষতিও বড় কম করে না। পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটায়।

অতঃপর সেই পচা পাঁকে আর এক ধরনের পরজীবী জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উৎপন্ন করে নানা বিষাক্ত গ্যাস—যেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এইভাবে নর্দমার মাধ্যমে যে সমস্ত পদার্থ বাহিত হয়, সেগুলি চরিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যায় বলে পরিবেশকে করে দূষিত। অপরদিকে যখন নদী কিংবা সাগরে মিলিত হয় তখন সেখানকার জলকেও দূষিত করে। অবাঞ্ছিত পদার্থ হিসাবে কিছু কিছু নদী এবং সাগরের তলদেশে জমা হয় আর জলচর প্রাণীদের করে প্রচণ্ড ক্ষতি। উক্ত কারণে মারা যাচ্ছে বহু মাছ। এই ধরনের দূষিত জলে মাছের ডিমও ভালভাবে ফুটে না। তাই মাছের বংশবিস্তারও ব্যাহত হচ্ছে। অপরদিকে উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করে বাসা বাঁধছে নানাপ্রকার ক্ষতিকর জীবাণু।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের জনবহুল নগরগুলির পার্শ্ববর্তী নদীর জল এইভাবে দূষিত। কোন কোন নদীর জল আবার নর্দমা বাহিত পাঁকের দ্বারা এত দূষিত যে, বিপদ সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। ভারতের পতিতপাবনী মা গঙ্গার বুকটাও কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী এবং কলিকাতার কাছে চরম বিষাক্ত। পান করলে তো কথাই নেই, স্নানেও

বিপদের সম্ভাবনা। আর কলিকাতার আদিগঙ্গার জলের তো কথাই নেই। দেখলেই বোঝা যায় কি পরিমাণ দূষিত। অথচ একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে এতখানি দূষিত হতে পারতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য পাকা নর্দমা আছে। যেখানে নেই সেখানেও পাকা নর্দমার ব্যবস্থা করা উচিত। আর উচিত নর্দমার মুখগুলিকে একত্রিত করে একটি বিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনেকগুলি জায়গায় বিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে তলানি-গুলি কৃষিক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যেতে হবে বা ভরাট করার কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং বাহিত জলকে ঝামা পাথরের স্তরের ভেতর দিয়ে চুইয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ফেলে দিতে হবে নদীতে বা সাগরে।

যেখানে প্রতিদিন দেশের হাজার হাজার মানুষ স্নান করার জন্য আসে, যেখানকার জল মানুষ পবিত্র মনে করে, সেখানকার জলকে এভাবে দূষিত করা ঠিক নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আর সচেতন হওয়া উচিত স্নানার্থীদেরও। জনবহুল এলাকায় স্নান না করে অন্যত্র স্নান করলে ভাল হয়।

নর্দমাবাহিত আবর্জনা তো বটেই জনবহুল এলাকায় কিছু কিছু সাধারণ মানুষ নদীগর্ভগুলিকে মলমূত্রে ভরিয়ে দেয়। একদিকে ওরা পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন নয় অপরদিকে বাসস্থানের সমস্যা। তাদের কিছুটা সচেতন করে তুলতে পারলে এবং মলমূত্র ত্যাগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে অনেক সুফল পাওয়া যেতো। আর যে-যে সুবিধাগুলির খোঁজে মানুষ শহরমুখী, সেই-সেই সুবিধাগুলির অন্ততঃ কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহরের জনসংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বাড়তে পারতো না।

(২) কলকারখানা কর্তৃক পরিত্যক্ত পদার্থসমূহ—

নদী ও সাগরের জলকে মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত আবর্জনা যতখানি দূষিত না করে তার চেয়েও বেশী করে কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থগুলি। একদিকে পরিত্যক্ত হচ্ছে পারদ, সীসা ও তামার মত

বিষাক্ত ধাতু অথবা ধাতব যৌগ, অপরদিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, ফেনল প্রভৃতি অজৈব ও জৈব যৌগ। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে বছরে প্রায় ছ লক্ষ টন সীসা ও পাঁচ হাজার টন পারদ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে নদী ও সাগরজলে। এদের প্রায় সবগুলিই জীবদেহের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু ঐ জলকেই আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে তাই আমাদের দেহেও সঞ্চিত হচ্ছে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থ। এবং এগুলি পরিনামে নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে।

মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটছে। একবার জাপানের একটি উপসাগরের মাছ খেয়ে প্রায় ১০০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। শোনা যায় সেই মাছ খেয়ে বিড়ালরাও পর্যন্ত মরেছিল! পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, উপসাগরটির তীরে প্লাস্টিকের কারখানা থেকে যে আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাতে ছিল প্রচুর পরিমাণে পারদঘটিত উপাদান। এদের প্রভাবে মাছেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দারুণভাবে। যে সব মাছ নদী-মোহানাগুলিতে ডিম পাড়তে ছুটে আসে তারা উক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। যে কোন মাছের ডিম ও চারা নষ্ট হয়ে যায় বিষাক্ত ধাতুগুলির প্রভাবে। সাগরজলে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের দেহেও অবাঞ্ছিত হিসাবে সঞ্চিত হয় এগুলি।

তাছাড়া তাপদূষণ প্রণালীতেও দূষিত হচ্ছে নদী ও সাগরজল। ব্লাস্ট ফার্ণেসের মত সুবৃহৎ ও মূল্যবান চুল্লীর বহির্ভাগকে শীতল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় ঠাণ্ডা জল। সেই জল উত্তপ্ত হয়ে গেলে নিষ্কাশন করে দিয়ে পুনরায় শীতল জল চালনা করা হয়। রিয়্যাক্টর ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেও অনুরূপভাবে শীতকের ব্যবস্থা থাকে। ওদের দ্বারা পরিত্যক্ত উষ্ণ জল বাহিত হয় নদীতে অথবা সমুদ্রে। যে সব মাছ উষ্ণ জল সহ্য করতে পারে না তাদের হয় ভয়ানক ক্ষতি। অথচ উষ্ণ জলটাকে অন্য কাজে ব্যবহার করলে অথবা ঠাণ্ডা করে নিক্ষেপ করলে বিশেষ ক্ষতি হত না। অন্যদিকে একটা বড় জলাধারে উষ্ণ জলকে সঞ্চয় করে বান জাতীয় মাছকে চাষ করলেও ভাল ফল পাওয়া যেতো।

কারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থগুলিকেও বিশোধন করা যায়। কোন কোন দেশ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করেছে। ভারতেও প্রযোজ্য হয়েছে কতকগুলো আইন।

(৩) সার ও কীটনাশক ওষুধ—

কৃষিক্ষেত্রে এখন ব্যাপকভাবে সার প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে নানা ধরনের কীটনাশক ওষুধ। এরা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নদী কিংবা সাগর জলে যায়। সারযুক্ত জল নদীর জলে পতিত হওয়ার ফলে নদীতে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের উন্নতি হয়। অথচ এদের নির্ভর করতে হয় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপর। অত্যধিক বংশবিস্তারের ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যয়িত হয় বেশি। পরিশেষে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যখন হ্রাস পায় তখন শেওলাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই মৃত শেওলাগুলি অবশেষে পচতে আরম্ভ করে এবং পচনের ফলে উৎপন্ন হয় নানা বিষাক্ত গ্যাস।

একদিকে অক্সিজেনের ঘাটতি অপরদিকে দূষিত গ্যাস, উভয়ে মিলে জলের বাসিন্দাদের ভয়ানকভাবে ক্ষতি করে এবং জল ও শেওলার প্রভাবে দূষিত হয়ে পড়ে।

অপরদিকে ডি. ডি. টি প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধের প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হয়। অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছরকাল ধরে চলে ওদের ক্রিয়া। তাই কীটনাশক ওষুধের অধিকাংশই নদী ও সাগর তলায় জীব ও উদ্ভিদের দীর্ঘকাল ধরে ক্ষতিসাধন করতে থাকে। তার উপর কিছু কিছু বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয় এদের দেহে। মাছের মাধ্যমে সেই বিষাক্ত জিনিসগুলি সঞ্চারিত হয় মানবদেহে।

ডি. ডি. টি-র প্রতিক্রিয়া এত উগ্র ও দীর্ঘস্থায়ী যে, যেখানে যেখানে ডি. ডি. টি আজ পর্যন্ত আদৌ ব্যবহার করা হয়নি সেখানে অর্থাৎ সুদূর দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইনদের মধ্যে এবং উত্তর মেরু অঞ্চলে এস্কিমোদের দেহেও পাওয়া গেছে ওর অস্তিত্ব।

সাগরের জল আরও দুটি কারণে দূষিত হয়। খনিজ তেলের দ্বারা এবং আমাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা। দুটি কারণের জন্য দায়ী আমাদের সভ্যতার চরম বিকাশ।

সাধারণত তৈলবাহী জাহাজগুলি সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। অসাবধানতাবশতঃ অথবা এমনিতে কিছু কিছু তেল জাহাজ থেকে গড়িয়ে পড়ে সাগরে। তাছাড়া দুর্ঘটনা তো আছেই। কখনও কখনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে জাহাজ থেকে তেলকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াও হয়।

বহু জায়গায় আবার সমুদ্রের মহীসোপান থেকে খনিজ তেলকে উত্তোলন করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু তেল সমুদ্র জলে মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে, তখন প্রচুর তেল পড়ে সমুদ্রের জলে। এই দুই উপায়ে সাগর জলে নিক্ষিপ্ত তেলের পরিমাণটা বড় কম নয়। বছরে প্রায় বিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টনের মত।

যেহেতু তেল জল অপেক্ষা হালকা, তাই জলের উপরে ভাসতে থাকে এবং একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। তেলের উপাদান আবার কতকগুলি হাইড্রোকারবন এবং অতি অল্প পরিমাণে সালফার ও অন্যান্য পদার্থ। এরা কিছুকাল এইভাবে ভাসতে থাকায় সূর্যকিরণ এবং পরিবেশের অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়ায় গঠন করে কতকগুলি যৌগ। সেই যৌগগুলি জল অপেক্ষা ভারী বলে থিতিয়ে পড়ে সাগরের তলদেশে। কিছু কিছু সঞ্চিত হয় সাগর তলার উদ্ভিদের দেহে। সাগরের যে সব জীব ঐ উদ্ভিদদের দ্বারা জীবনধারণ করে তাদের হয় ভয়ানক ক্ষতি। যার ফলে সাগরের বহু বাসিন্দা হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার বেশী তেলের প্রভাবে সাগরের বুকে আগুনও ধরে যায়। সেই আগুন কখনও কখনও তীরের দিকে ছুটে এসে জনপদ সমূহে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

সাগর জলে বর্তমানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। কোন কোন দেশ গভীর সমুদ্রে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং

ভবিষ্যতেও ঘটাতে পারে। তার উপর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলি থেকে নিষ্কাশিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থগুলি ইস্পাতের পাতে মুড়ে গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সাগরজলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়ে উঠছে মাত্রাতিরিক্তভাবে।

এর প্রভাব কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক। সাগরজলের কোন বাসিন্দাই এর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়া হবে তাদের শরীরে এবং তাদের বংশধররাও সে ক্রিয়া থেকে রেহাই পাবে না। আর আমরা যারা সাগরের মৎস্য শিকার করে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে চাই তাদের দেহেও সঞ্চিত হবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এইভাবে যদি তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে তাহলে এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে মানুষকে।

এবার আমাদের পানীয় জলের কথায় আসা যাক। পল্লী অঞ্চলের মানুষ, যেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সেখানে নদী, পুকুর, কূপ অথবা টিউবওয়েলের জল পান করে। সবদিক থেকে বিচার করে দেখলে যে সব টিউবওয়েলের জল একটু গভীর থেকে আসছে সে জল বেশ ভালই। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই জলে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ধাতু বা ধাতব যৌগ মিশে থাকতে পারে। একটু পরীক্ষা করে নিতে পারলেই নিরাপদ হওয়া যায়।

সমস্যা শহরে। সেখানকার নদীর জল পান তো দূরের কথা, ব্যবহারেরও অযোগ্য। তাই জল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বস্তি এলাকায় কিছু কিছু টিউবওয়েলের জলও পানের জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যত্রও আছে। তবে অধিকাংশের জলই অল্প বিস্তর দূষিত।

শহরের আবর্জনা সঙ্কুল অঞ্চলে অতি অল্পেই জল দূষিত হয়ে পড়ে। মাটির তলায়ও চারদিকে নোংরা। খাল, নদী কিংবা আবর্জনাপূর্ণ ডোবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে যোগ। যত গভীর থেকে টিউবওয়েলের জল সংগ্রহ করা উচিত, অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে তত গভীর থেকে জল সংগ্রহ করা হয় না। অনেক সময় জল সরবরাহের

নলও ফেটে যায়। ফলে নানা দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে আসে পানীয় জল।

বেশীরভাগ শহরে জল সরবরাহ হয় নদীর জলকে বিশোধিত করে। শহরের নিকটবর্তী নদীর জল নানা কারণে দূষিত। সেই দূষিত জলকে শোধন করে এবং তাতে জীবাণুনাশক পদার্থ মিশিয়ে পানের যোগ্য করে তোলা হয়। যে উপায়গুলি অবলম্বন করা হয় তাতে পানীয় জল যে একেবারে ত্রুটিমুক্ত হয়ে যায় এমন নয়। জীবাণুশূন্য জলেও থেকে যায় জলে দ্রবীভূত কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থ। সেগুলি জলের মাধ্যমে শরীরে যায়। এবং নানাবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জলকে জীবাণুশূন্য করার জন্য যে ক্লোরিন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, তাও যে একেবারে ত্রুটিমুক্ত তাও বলা চলে না। অপরদিকে যে পাইপে জল সরবরাহ করা হয় সেগুলি সীসার পাইপ। ওতে ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি অশুদ্ধি থাকে। যদিও খরজলের প্রভাবে সীসা কোন ক্ষতি করতে পারে না তবু ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি অশুদ্ধিগুলি জলে এসে যায়।

স্থলভাগ দূষণ

মাটি মায়ের চেয়েও বড়। মাটির বুকে আমরা ভূমিষ্ঠ হই। মাটি মায়ের মত স্নেহ দিয়ে, অন্ন ও বস্ত্র দিয়ে, প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে আমাদের প্রতিপালন করে থাকে। অথচ সেই মাটিকে আমরা ধীরে ধীরে দূষিত করে ফেলছি।

মাটির দূষণ বলতে মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানের হ্রাস ও অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহের সঞ্চয়—যা বর্তমান জীব ও উদ্ভিদজগতের পক্ষে অমঙ্গল-জনক। জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ, প্রাণীর মলমূত্র ইত্যাদি মাটিকে দূষিত করে না বরং মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তৈরী করে। এখানে অবাঞ্ছিত পদার্থ বলতে মাটির রূপান্তর ঘটানোর উপাদান—কঠিন আবর্জনা ও বিষাক্ত পদার্থসমূহের প্রয়োগ।

মাটির দূষণ আরম্ভ হয়েছে বন অপসারণের সময় থেকেই। উদ্ভিদের দেহাবশেষ ও পাতা থেকে জীবাণুদের দ্বারা প্রয়োজনীয় উপাদান হিউমাস তৈরী হচ্ছে না। তার উপর উদ্ভিদদের অপসারণের ফলে মাটির ক্ষয় হচ্ছে ব্যাপকভাবে। অপরদিকে বন কেটে নগর বসেছে। গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা। কেবল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে পরিত্যক্ত আবর্জনা নয়, কলকারখানাগুলোও পরিত্যাগ করছে রাশি রাশি আবর্জনা তথা বর্জ্যপদার্থ। ধাতুমল নামের বর্জ্য পদার্থগুলি কি হারে যে বেড়ে চলেছে, তা যে কোন ইস্পাত নগরীর দিকে লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়।

শুধু কি তাই! মানুষ যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের পরিমাণ। ভাঙ্গা শিশিবোতল, পেষ্টের ও ওষুধের মোড়ক, ছেঁড়া কাগজ থেকে আরম্ভ করে টিন ও লোহার পাত্র, প্লাস্টিকের ও পলিথিনের টুকরা প্রভৃতি কত ঢালছি আমরা মাটিতে। তার উপর আছে ছাই, তরিতরকারির খোসা, মাছের আঁশ-কাঁটা প্রভৃতি আরও

কত পদার্থ! বড় বড় রাস্তায় চোখে পড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গা মোটরগাড়ী ও রেলগাড়ীর বগি। এরা তেমনই বছরের পর বছর পড়ে আছে আর ক্ষয়ে ক্ষয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

এইভাবে নানা অবাঞ্ছিত পদার্থ সঞ্চিত হচ্ছে মাটির বুকে। সত্যকথা বলতে কি, বর্তমানে আমাদের পরিত্যক্ত আবর্জনা থেকে মাটিকে মুক্ত রাখা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে দেশে শিল্পের যতই উন্নতি হবে ততই বৃদ্ধি পাবে জঞ্জালস্তূপ। অর্থাৎ সমস্যা আরও তীব্রভাবে দেখা দেবে। এমনিতে আজই যে কোন শিল্পনগরীর চতুস্পার্শ্ববর্তী এলাকাকে একবার পর্যবেক্ষণ করলে শিউরে উঠতে হয়। অতএব আগামী পঞ্চাশ বছর পরে কি হবে? দুনিয়াটা কি ভরে যাবে কেবল আবর্জনায়?

যে কোন জৈব পদার্থ মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। কিন্তু ধাতব পদার্থ মাত্রই মাটিতে মিশে যেতে পারে না। ওরা মাটিতে বছরের পর বছর পড়ে থাকে। পরিবেশের বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়ায় গঠন করে—কেবল ধাতব যৌগিক। ওদের উপস্থিতি মাটির পক্ষে ক্ষতিকর। অনেক সময় যৌগগুলির প্রভাবে মাটি অতিরিক্ত আম্লিকও হয়ে পড়ে।

আমরা কিছুটা সাবধান হতে পারলে এবং আরও পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করলে মাটির দূষণ কিছুটা রোধ করতে পারি। প্রথমে আমাদের যেখানে সেখানে আবর্জনা নিক্ষেপ করার কুঅভ্যাসগুলিকে ত্যাগ করতে হবে। যে সব আবর্জনা উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী যথা তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ছাই ইত্যাদিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত করে ঢেলে পরিশেষে তার উপরে কোন গাছের চারাকে রোপন করলে খুবই ভাল হয়। লাভ হবে দুদিক থেকেই। গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে ফল দেবে প্রচুর আর বাতাসকেও শুদ্ধ করবে আর যে সব আবর্জনা উদ্ভিদের অনুপযুক্ত তাদের মাটির ভেতরে পুঁতে ফেলাই কর্তব্য।

শহরের মানুষের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবোধ আরও বাড়ানো উচিত। কেবল ঘরের সামনে নয় গলির মোড়েও যদি আবর্জনা জমে উঠে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাফ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে আবর্জনা

পরিবহনেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ব্যবস্থার মধ্যে যেন কোন প্রকারের ত্রুটি না থাকে। আবর্জনাগুলিকে দূরে বহে নিয়ে গিয়ে কোন নিচু জমিতে কেবলমাত্র ফেলে না দিয়ে তার উপর মাটির পুরু আস্তরণ ফেললে খুবই ভাল হয়।

কলকারখানা কর্তৃক বর্জিত কঠিন, ভাঙ্গা ধাতব জিনিস পুড়িয়ে ফেলা উচিত। তাহলে এগুলোকে দুদিক থেকে কাজেও লাগানো যায়। প্রথমত কিছু ধাতুকে পুনরুদ্ধার করা যায় এবং তাপকেও প্রয়োগ করে সাধারণ ভাবে কোনকিছুকে উষ্ণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত যে ছাইটা পড়ে থাকবে তা থেকে ভাল ইটও তৈরী করা যাবে। ভাঙ্গা শিশি বোতল থেকে পুনরায় নতুন কাচের জিনিসপত্র তৈরীও করা যায়। রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশ এবং তার কাটামোকে এমনিতে ফেলে না রেখে যন্ত্রের সাহায্যে ভালভাবে গুঁড়া করে পুনরায় লোহাকে নিষ্কাশন করে নিলে ভালই হয়। এদিক থেকে সরকারী উদ্যোগ যদি বর্ধিত হয় তাহলে অনেকখানি জঞ্জালমুক্ত হবে দেশ।

কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনেককে দেখা যায় আবর্জনাস্তূপ থেকে ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা শিশি বোতল, পরিত্যক্ত ধাতব পাত্র, পলিথিন ও প্লাস্টিকের টুকরা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। ওরা বিভিন্ন কারখানায় এগুলিকে চালান দেয়। আমরা যদি আমাদের অব্যবহার্য কঠিন বস্তুগুলিকে যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় জড় করে রাখি এবং ঐ সব দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দি তাহলে ঐ মানুষদের ঘৃণ্য জঞ্জাল হাতড়াতে হয় না আর আমরাও স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মুক্তিলাভ করি।

কলকারখানাগুলির বর্জ্য পদার্থ এবং কোন কোন ধাতুমলকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব বর্জ্য পদার্থ থেকে সার ও সিমেন্ট উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। যে কোন দেশের পক্ষে এটি একটি বড় লাভ।

জঞ্জাল ছাড়া অন্য দুটি প্রধান কারণে পৃথিবীর মাটি দিন দিন অপবিত্র হতে চলেছে। দুটিই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, দ্বিতীয়

বিশ্বমহাসময়ের সময়ে বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অতি ভয়ঙ্কর অবদান। একটি কীটনাশক ওষুধ এবং অপরটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার।

(১) কীটনাশক ওষুধ –

কীটনাশক ওষুধকে সাধারণত পেস্টিসাইড বলা হয়। উদ্ভিদের রোগ পোকা দমনে, আগাছা নিবারণে আজকাল পেস্টিসাইডকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোর সবই রাসায়নিক বিষ।

রাসায়নিক গঠন অনুসারে পেস্টিসাইডকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ক্লোরিনঘটিত যৌগ, ফসফেটঘটিত যৌগ ও জৈব ধাতুর যৌগ। ডি. ডি. টি, অ্যালড্রিন প্রভৃতি ক্লোরিনঘটিত, ইথাইল প্যারাথিওন, প্যারাথায়োন প্রভৃতি ফসফেটঘটিত এবং ফিনাইল মারকিউরিক অ্যাসিটেট ইত্যাদি জৈব ধাতব যৌগ। এদের সবারই আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রসায়ন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। বর্তমানে পৃথিবীতে এই জাতীয় ওষুধ আরও প্রস্তুত করা হচ্ছে। যার ফলে জল, বায়ু, মাটি সবাই কিছু না কিছু দূষিত হচ্ছে।

পেস্টিসাইডগুলির মধ্যে ক্লোরিনঘটিত যৌগই সর্বাধিক ক্ষতি করে থাকে। এদের মধ্যে ডি. ডি. টি আবার সবচেয়ে বড় শত্রু। ডি. ডি. টির পুরো নাম ডাই ক্লোরো ডাই ফিনাইল ট্রাই ক্লোরো ইথেন। এটির কীটনাশকগুণ আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত সুইডিশ বিজ্ঞানী পি. মূল্যার ঐ আবিষ্কারটির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিতও করা হয়েছে।

প্রথম প্রথম ডি. ডি. টিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো মশা ও ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের দমনে। তারপর কীটনাশক হিসাবে ডাক পড়ে কৃষিক্ষেত্রে। সেই থেকে ডি. ডি. টি, বি. এইচ. সি প্রভৃতি ক্লোরিনঘটিত যৌগ আজও ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে।

আমাদের পরিবেশের যে কোন পদার্থের উপর ডি. ডি. টির প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও সুদূরপ্রসারী। মাটিতে, জলে ও বায়ুতে ওর প্রভাব থাকে দীর্ঘকাল। এটি যে কোন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হতে

পারে বলে উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত হয়। সেই উদ্ভিদকে আমরা আবার খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। তাই পরোক্ষভাবে ডি. ডি. টির ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের দেহে পড়ে। এটি জলে দ্রবনীয় নয়। তাই দেহে প্রবেশ করলেও ঘাম বা মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিতও হতে পারে না। জমা হয় চর্বির মধ্যে। ফলে মানবদেহে সৃষ্টি হয় নানা রোগের। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, ডি. ডি. টি ইঁদুরের দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। আজকাল ক্যানসার যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তার মূলে ডি. ডি. টিরও একটা প্রভাব আছে বলে ধরা যেতে পারে।

কেবল তাই নয়, ডি. ডি. টি মায়েদের দেহের চর্বিতে সঞ্চিত হলে তাঁর সন্তানের দেহেও সঞ্চারিত হয়। এর প্রভাবে শিশু-বিকলাঙ্গ ও বিকৃত মস্তিষ্কও হতে পারে।

ডি. ডি. টির প্রভাবে পশুপাখীর প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এর প্রভাব পাখীদের উপরে পড়লে তাদের ডিমে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় এবং ডিম ভঙ্গুর হয়। অনেকক্ষেত্রে সে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হতে পারে না। উক্ত কারণেই মনে হয় অধিকাংশ পাখী ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে কীটনাশক ওষুধ মাত্রই মাটির প্রচণ্ড ক্ষতি করে। এদের প্রভাবে মাটিতে অবস্থানকারী উপকারী জীবাণুরা বেঁচে থাকতে পারে না। মাটি শক্ত হয়ে উঠে এবং উর্বরতা হারায়। ফলে প্রয়োগ করতে হয় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার। সে সারও মাটির ক্ষতিসাধন করে এবং কিছু কিছু অংশ উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত হয়।

পেস্টিসাইডগুলির বৈশিষ্ট্য ওরা সাময়িকভাবে কীটপতঙ্গের বিনাশ ঘটালেও একাদিক্রমে একই পোস্টসাইডকে ব্যবহার করতে থাকলে পরিশেষে কোন সুফল লাভ করা যায় না। কারণ, নিম্ন শ্রেণীর কীট, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি সহনশীলতা অর্জন করে নেয়। সেই কারণেই বিভিন্ন পেস্টিসাইডের খোঁজ করতে হয় এবং কীটরা সহন-শীলতা অর্জন করে নেই বলেই আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার রকম

পেস্টিসাইডের প্রচলন হয়েছে।

একমাত্র ক্লোরিনঘটিত যৌগগুলি ব্যতীত অপর কীটনাশক এত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। ডি. ডি. টি থেকে মুক্ত ক্লোরিন বায়ুমণ্ডলকেও বিধ্বস্ত করছে। তাই ক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক যথা ডি. ডি. টি, বি. এস. সি, অ্যালড্রিন প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই বিধেয়। ওদের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি জ্ঞাত হওয়ার পর কোন কোন দেশ এদের একেবারে নিষিদ্ধই করে দিয়েছে। কিন্তু ভারতে এদের ব্যবহার অব্যাহতই আছে।

এ বিষয়ে ভারতেরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত এবং কারখানাগুলি যাতে ডি. ডি. টি জাতীয় বস্তু উৎপাদন করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কৃষকদেরও কিছুটা সাবধান হতে হবে। যে কোন ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাব জ্ঞাত হতে হবে। সস্তায় ডি. ডি. টি, বি. এইচ. সি, ইত্যাদি পাওয়া গেলেও সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। মনে রাখতে হবে শহরের পরিবেশ যত না দূষিত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী দূষিত হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের মাঠঘাট, জল ও বায়ু। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখের দিকে তাকিয়ে যে কোন কৃষকের এখনই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা—

ভূপৃষ্ঠে অত্যন্ত বিরল হলেও এমন এক-একটি আকরিক পাওয়া যায়, যার মধ্যে থাকে এক-এক ধরনের বিশেষ মৌলিক পদার্থ। ঐ মৌলিক পদার্থদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা অত্যন্ত ভারী ধাতু এবং আলো কিংবা অন্ধকারে সর্বাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত ও অনর্গলভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। ঐ রশ্মিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় আলফা কণা, বিটা কণা ও গামারশ্মি। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি এই জাতীয়। ওদের দেহ থেকে রশ্মি নির্গত হয় বলে বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বা "রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট" এবং ঐ রশ্মি নির্গমন ক্রিয়াকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। প্রকৃতির কোথাও কোথাও মৌলিক পদার্থ হিসাবেও

ওদের দু-একজনকে অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীরের যে কোন অংশের উপর ঐ রশ্মি মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি ক্যানসারের মত অতি ভয়ঙ্কর রোগেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনও দেখা গেছে, আমাদের দেহকোষের মধ্যস্থিত বংশধারার নিয়ামক জিনকেও প্রভাবিত করে। ফলে বংশধারার মধ্যে আসতে পারে আমূল পরিবর্তন।

এহেন মারাত্মক পদার্থ পৃথিবীর মাটিতেই থাকে। তবে পরিমাণটা এত কম যে, বছরে যে হারে রশ্মি নির্গত হয় তাতে মানুষ কেন কোন জীবেরই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বর্তমানে শিল্প ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে সর্বত্রই দেখা দিয়েছে শক্তির সঙ্কট। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মেটাতে গিয়ে প্রকৃতি আজ যেন রিক্তা। তার ভাণ্ডারে যত কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও স্বাভাবিক গ্যাস ছিল তা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে আরম্ভ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন ব্যবহার হচ্ছে হাজার হাজার টন কয়লা। কিন্তু মানুষ তো আর সুখ-সুবিধাগুলিকে পরিত্যাগ করে নগর থেকে অরণ্যে যেতে চাইবে না! বরং বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে উত্তরোত্তর তার চাহিদাকে বাড়িয়ে ফেলছে। সে চাহিদা নানা শিল্পজাত বস্তুর চাহিদা এবং শিল্পকে ঠিক রাখতে গিয়ে দরকার হচ্ছে প্রচুর শক্তির।

মানুষ তাই শক্তির সঙ্কট মেটাতে ধর্ণা দিয়েছে সেই তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থদের কাছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ না হলে তো সব শিল্পই অচল হয়ে যাবে। আর এই বিদ্যুতের বড় অংশই আসে কয়লা, তেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসকে পুড়িয়ে। যেহেতু এদের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাই ভারী ঐ তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থদের পরমাণুদের নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে এবং এরই ফলে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি। সেই শক্তি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শক্তির চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হচ্ছে পারমাণবিক

শক্তি। যেহেতু ঐ পারমাণবিক শক্তির মূল উৎস তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলি। তাই ওদের সংগ্রহ ও ব্যবহার করার জন্য হিড়িক লেগে গেছে। মানুষ সুবিধা করতে গিয়ে পাতালপুরীর গর্তে ঘুমন্ত কাল-কেউটেকে ধরে এনে জীবন-মরণ খেলা শুরু করে দিয়েছে।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে শক্তি উৎপাদনের পর যে সব পদার্থগুলি পরিত্যক্ত হয় তাতে কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা অবশ্যই থেকে যায়। সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা হয়। বর্জ্য পদার্থগুলিকে বিশেষ আধারে সংরক্ষিত করে পুঁতে দেওয়া হয় মাটিতে, নয়ত গভীর সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত করা হয়। তা সত্ত্বেও তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না পৃথিবীর মানুষ। তাই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ।

এক্ষেত্রে অবশ্য খুব একটা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। এক-একটি পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই বছরে সেখান থেকে যতটুকু আবর্জনা পাওয়া যায় তার পরিমাণও নগণ্য বলা যেতে পারে। তার চেয়ে বরং বেশী ক্ষতি করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জিত ছাই। যেহেতু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হাজার হাজার টন কয়লা ব্যবহার করা হয়, তাই এখান থেকে উৎপন্ন আবর্জনা তথা ছাইর পরিমাণ খুব বেশী। আর উক্ত ছাইর মধ্যেও থাকে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম-২২৬।

অপরদিকে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভাজিত হলে যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয় তাকে মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজেও নিয়োগ করছে। অর্থাৎ প্রস্তুত করছে ভয়ানক সব পরমাণু বোমা। আপন ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে কোন কোন দেশ নিয়মিতই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এর ফলে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে তেজস্ক্রিয় ভস্ম। এর প্রতিক্রিয়াটাও বড় ভয়ানক। পৃথিবীর জল, মাটি, আকাশ ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে দূষিত হয়ে উঠছে। আমাদের হাতের কাছেই আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তথা হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমা। সেই কবে দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের শেষ পর্যায়ে দুটি

শহরকে ধ্বংস করা হয়েছিল, অথচ তার প্রতিক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। অতএব যাঁরাই এই জাতীয় বোমা নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন, তাঁরা যত সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন পৃথিবীর পরিবেশ অল্পবিস্তর দূষিত হচ্ছেই।

এইভাবে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে এবং কোন দেশ যদি ক্ষমতাগর্বে দু-একটা অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে বসে তাহলে ভবিষ্যতে এক রুগ্নসমাজের জন্মদান করবে পৃথিবী। এমনিতে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলি থেকে ছড়াচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা, তার উপর মুষ্টিমেয়ের খেয়াল চরিতার্থের জন্য সমগ্র পৃথিবী যেন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। যে কোন দূষণে তবু রক্ষা আছে, কিন্তু পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে দূষণের সঙ্গে কোন কিছুর তুলনাই হয় না। যারা বেঁচে থাকবে তারা পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হবে এবং তাদের সন্তানরাও হবে বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন। বংশ বংশ ধরে চলবে প্রতিক্রিয়া।

তাই যতদিন পর্যন্ত না বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ হচ্ছে ততদিন ভয় থেকে যাচ্ছে। আর যতদিন পর্যন্ত না বিকল্প শক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ততদিন মানুষের চাহিদা মেটাতে দূষণ চলবেই।

শব্দ দূষণ

আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদির মত শব্দও একপ্রকার শক্তি। কে না জানেন বাজপড়ার শব্দে ঘরের দরজা জানালা ঝনঝন করতে থাকে? মনে হয়, শব্দের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা অতি প্রাচীনকালেও মানুষের মনে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা হয়ত এ বিষয়ে গবেষণাও করেছিলেন। তাই শব্দের মধ্যেও লক্ষ্য করেছিলেন ব্রহ্মের প্রকাশ।

শব্দের শক্তি যে কত ভয়ানক হতে পারে—তা আজকের দিনে যে কোন একটা জনবহুল শহরের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আকাশে জেটবিমানসমূহের গগনবিদারী গর্জন, মাটিতে বাস-লরি-ট্যাক্সি-টেম্পো-মোটর সাইকেলের তীব্র হর্ন, মাইকের একটানা চিৎকার, প্রচণ্ড জন কোলাহল, তার উপর ফেরিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের প্রবল প্রতিযোগিতা যে কোন অনভ্যস্ত মানুষের পঞ্চত্ব পাওয়ার সামিল। অভ্যস্ত যাঁরা, তাঁদেরও কান ঝালাপালা হয়ে যায়, চিৎকার, কোলাহল থেকে পালিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একেবারে যাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, বুঝতে হবে তাঁদের শ্রবণশক্তির ত্রুটি এসে গেছে এবং সে ত্রুটি এসেছে অবাঞ্ছিত তীব্র আওয়াজের মধ্যে কাল কাটাতে কাটাতে।

উচ্চ শব্দ মানুষের চরম অনিষ্ট করে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে সব অঞ্চলে উচ্চ শব্দের উদ্ভব হয় সে সব অঞ্চলের মানুষদের শ্রবণশক্তি বেশ ক্ষীণ। বধিরের সংখ্যাও যথেষ্ট। আবার এমনও দেখা গেছে, কিছুকাল উক্ত পরিবেশে থাকলে পরিণামে অনেকে বধিরও হয়ে পড়ে। খুব জোর শব্দ যথা বোম, পটকা ইত্যাদি ফাটতে থাকলে আমাদের শিরা এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রচণ্ডভাবে চাপ পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জাতীয় শব্দের প্রভাবে সাময়িকভাবে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়, স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে হরমোন

নিঃসরণ ঘটায়। ঐ হরমোন আবার রক্তে কোলেষ্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে শারীরবৃত্তীয় কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে মনের উপরও পড়ে দারুণ চাপ।

উচ্চ শব্দ মাত্রই শারীরবৃত্তীয় কাজে বিঘ্ন ঘটায় বলে নানা রোগেরও সৃষ্টি করে থাকে। এর প্রভাবে আলসার, মস্তিষ্কের গোলমাল, হৃদ-রোগ, এমনকি সন্ন্যাসরোগও হতে পারে। অনেক উপসর্গও প্রকাশ পায়। যেমন বদরাগী, খিটখিটে, খেয়ালিপনা ইত্যাদি।

তীব্র শব্দ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিসাধন করে শিশুদের। ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায় তাদের, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়। ছেলেবেলা থেকেই বদমেজাজী ও খিটখিটে হয়ে উঠে।

আজকের তরুণদের প্রতি বয়স্করা অনেক সময় কটু মন্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। তরুণরা বেপরোয়া, অবাধ্য, বদরাগী, উচ্ছৃঙ্খলা, পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে না, ইত্যাদি কত কি! তাঁরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এর মূলে আমাদের বর্তমান পরিবেশ অনেকখানি দায়ী। ধীরে ধীরে আমাদের পরিবেশ এমন মাত্রাছাড়া হয়ে উঠেছে যে, শারীরবৃত্তীয় কাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানারকমের বাধা। কোন কিছুতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা হারাচ্ছে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হচ্ছে, মস্তিষ্কের বিকার আসছে, ফলে বিচারবুদ্ধিও লুপ্ত হচ্ছে। অপর দিকে যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণ করছে তার মাধ্যমেও শরীরে অনুপ্রবেশ করছে নানা অবাঞ্ছিত পদার্থ। আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে কী এই ধরনের পরিবেশ ছিল? দুর্ভাবনা এই, এর পরে পরিবেশ যখন আরও বিষিয়ে উঠবে তখন অনাগতদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন হবে?

শব্দের দূষণ যে বড় ভয়ানক, এই সত্যটিই আমাদের অনেকের জানা নেই। ইচ্ছে করেই অনেকে এমন অবাঞ্ছিত উচ্চ শব্দের সৃষ্টি করেন, যার ফলে ঘরের ছেলেমেয়েদেরই চরম ক্ষতি হয়ে থাকে। অযথা ঝগড়া করা, চিৎকার করে কথা বলা, রেডিওর ভল্যুমকে ইচ্ছে মত বাড়িয়ে দেওয়া,

স্টিরিওফোনিক শব্দ শোনা ইত্যাদি। অজ্ঞতার আরও নজির দেওয়া যেতে পারে। দীপাবলীর রাত্রিতে অনেক লোককে দেখা যায়—যাঁরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে বোম, পটকা ইত্যাদি ফাটাতে মেতে উঠেছেন। গতানুগতিক জীবনযাত্রার মাঝে একটু আনন্দের স্বাদ আহরণ করতে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদেরই যে চরম সর্বনাশ করছেন—একথা একবারও চিন্তা করেন না। চিন্তা করেন না, সারারাত ধরে এইভাবে শহরের পরিবেশকে ধোঁয়া ও শব্দের দ্বারা দূষিত করে কি অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করছেন।

এর উপর আছে আমাদের আনন্দানুষ্ঠান, পূজা পদ্ধতি ইত্যাদি। মাইকের একটানা গম গম আওয়াজ, ঢাকীর ঢাকের শব্দ, বাজি পোড়ানোর শব্দ, সবই শব্দদূষণের নামান্তর।

এই তো গেল ঘরের কথা। এবার বাহিরের কথায় আসা যাক। মোটর গাড়ীর ড্রাইভাররা অতি দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাতে থাকেন আর জোরে জোরে হর্ন দিতে থাকেন। এমন অনেক গাড়ী রাস্তায় চলে, যাদের সাইলেন্সারের আছে গোলমাল। রাস্তায় পুরানো গাড়ীর সংখ্যাও কম নয়। এদের কাছ থেকে যে বিকট আওয়াজ পাওয়া যায় তাতে যথেষ্টভাবে শব্দের দূষণ হয়।

অতএব ঘরে বাহিরে সর্বত্র চলছে শব্দের দূষণ। এই দূষণ থেকে মুক্ত থাকতে সবাইকে যত্নবান হতে হবে। মনে রাখতে হবে, তীব্র শব্দ মাতৃজঠরে শিশুরও ক্ষতি করে। কখনও কখনও প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কায় মাতৃগর্ভে মৃত্যুকেও বরণ করে শিশু। আনন্দের আতিশয্যে যখন আমরা বোম ফাটাই, তখন একবারও ভেবে দেখি না কাছে পিঠে অন্যমনস্কা কোন গর্ভবতী জননী থাকলেও থাকতে পারেন।

এখন প্রশ্ন আসবে, কোন্ শব্দ আমরা শুনবো এবং কোন শব্দ আমরা শুনবো না বা সেই শব্দ উৎপাদনে আমরা বাধা প্রদান করবো।

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে শব্দের তীব্রতা এবং তীব্রতামাপক স্কেল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, কম্পনশীল বস্তু থেকেই শব্দের উৎপত্তি হয়। একই

সময়ে কোন কম্পনশীল বস্তুকণা যে সংখ্যক বার কম্পন সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় বস্তুকণাটির কম্পাঙ্ক। সাধারণত এক সেকেণ্ড সময়ে কম্পন স্থির করা হয় এবং এর একক ধরা হয় বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎসের নামানুয়ায়ী।

দেখা গেছে, ২০ হার্ৎস থেকে ২০০০০ হার্ৎস কম্পাঙ্কের শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। তবে কেউ কেউ নিম্নতম ১৬ হার্ৎস এবং উর্ধ্বতম ২৫০০০ হার্ৎস কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দও শোনার ক্ষমতা রাখেন।

আমরা যে সব শব্দ শুনতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে কিছু প্রাকৃতিক শব্দ এবং কিছু আমাদের দ্বারা কৃত্রিম শব্দ আছে। মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, বর্ষার ঝর ঝর শব্দ, বায়ুর শনশন, জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি সবই প্রাকৃতিক শব্দ। অপরদিকে আমাদের নির্মিত যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভুত শব্দ গলার স্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি কৃত্রিম শব্দ।

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সুরসমৃদ্ধ শব্দ ও সুরবর্জিত শব্দ। যে সমস্ত শব্দ আমাদের শ্রুতিমধুর বলে মনে হয় তাকে বলে সুরসমৃদ্ধ শব্দ এবং যেগুলি শ্রুতিকটু তাইই সুরবর্জিত। তবে এখানেও চুলচেরা বিচার করা যায় না। কারণ, শব্দের আবেদন বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন কেউ রেডিও ও মাইকের জোরালো গান শুনতে ভালবাসেন আবার কেউ এমন জোরালো গানকে নিন্দা করেন। তবে যতই সুরসমৃদ্ধ হোক না কেন তীব্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সবার কাছে অসহ্য মনে হয়।

আমরা আরও জানি, শব্দ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দতরঙ্গ তার সঞ্চারপথের উপর লম্ব এমন একক ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে যে হারে শক্তি পরিবাহিত করে তাকেই বলা হয় তীব্রতা। তীব্র শব্দ যতই তার উৎস থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ততই শব্দ তরঙ্গের শক্তিও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সাধারণত দেখা গেছে, কম্পনশীল বস্তুর আকার যত বড় হয় ততই শব্দের তীব্রতা বাড়ে। আর আমরা অনেকক্ষেত্রে কোন সঙ্কেতকে দূরে পাঠাতে তীব্র শব্দ উৎপাদনের উৎস ব্যবহার করি। যেমন গাড়ীর হর্ণ, হুইসিল,

সাইরেন ইত্যাদি। অপরদিকে বিস্ফোরণের মাধ্যমেও তীব্র শব্দ সৃষ্টি করে থাকি। তবে শব্দ যত তীব্র হোক না কেন শব্দের তীব্রতা উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলে দূরত্ব বাড়লেই হ্রাস পাবে। তাই যেখানে উৎস সেইখানেই তীব্রতা অনুভূত হয় সর্বাধিক এবং প্রকৃতপক্ষে সেই অঞ্চলটাই তীব্র শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আমাদের কানের একটা সংবেদনশীলতা আছে। এই সংবেদনশীলতা ৩০০০ থেকে ৫০০০ হার্ৎস কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক। দেখা গেছে, অনুরূপ ক্ষেত্রে বায়ুচাপের তারতম্য হয় মাত্র ০.০০০২ ডাইন/সেমি^{২}। শব্দের তীব্রতায় বায়ুচাপের তারতম্য বাড়তে বাড়তে ২০০ ডাইন/সেমি^{২} এ এসে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না শরীরের। কিন্তু তার উপরে উঠলেই নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

শব্দের তীব্রতা সাধারণত শব্দের চাপমাত্রা বা SPL. দ্বারা নির্ণয় করা হয়। ২০ হার্ৎস কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ, যা আমাদের কানের কাছে ধরা পড়ে তার চাপমাত্রা হয় ২০ × ১০ $-$ ৬ প্যাস্কাল। অনুরূপ হিসাবে শব্দের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে আমদানি হয় এক-একটি জটিল সংখ্যা। সেই কারণে সহজভাবে প্রকাশের জন্য শব্দের তীব্রতাকে ডেসিবেল স্কেলে প্রকাশ করা হয়। বলাবাহুল্য, প্রখ্যাত টেলিফোন আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেলের নামানুসারে উক্ত স্কেলটি প্রবর্তিত হয়েছে। কোন তীব্রতার সঙ্গে প্রমাণ কোন তীব্রতার তুলনা করে যে অনুপাতটি পাওয়া যায় তার লগ (log) গ্রহণ করলে হয় “বেল” এবং বেলের এক দশমাংশ ডেসিবেল।

অতি মৃদু শব্দ যা কেবলমাত্র আমাদের কানের কাছে ধরা পড়ে তাকে ধরা হয়েছে O ডেসিবেল। স্কেলটি এমনভাবে তৈরী যে, শব্দের চাপমাত্রা ১০ গুণ বাড়লে ডেসিবেলে মাত্রা বাড়ে ২০ গুণ। সেই হিসেবে একটি হাত ঘড়ির মৃদু টিক টিক শব্দ ২৫ ডেসিবেল।

ডেসিবেলে প্রকাশ করলে একটি বাস ইঞ্জিনের আওয়াজ ৭০ থেকে ৮০ ডেসিবেল, লরির আওয়াজ ৭৫ থেকে ৯৫ ডেসিবেল, মোটর সাইকেলের ১০৫ ডেসিবেল, অফিস এলাকার কোলাহল ৯০ ডেসিবেল,

মোটরগাড়ির হর্ণের আওয়াজ ১০০ থেকে ১০৫ ডেসিবেল, মাইকের শব্দ ১০০ ডেসিবেলের উপরে, জেট বিমানের শব্দ মাটি থেকে পাওয়া যায় ১২৫ ডেসিবেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সংখ্যাগুলি স্থির নয়। উৎস থেকে তীব্রতা যেহেতু বাড়ে ও কমে, তাই ডেসিবেলের পরিমাণও বাড়ে কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ৪০ থেকে ৭০ ডেসিবেল তীব্রতাযুক্ত শব্দ আমাদের বিরক্তিকর নয় এবং কোন ক্ষতিও করে না। তীব্রতাযুক্ত ৭০ ডেসিবেল থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকলেই শরীরে নানারকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যখন বাড়তে বাড়তে ১০০ থেকে ১২০ ডেসিবেলে পৌঁছে তখন কানে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তারপর বিস্ফোরণ ইত্যাদি শব্দ যার তীব্রতা ১৪০ ডেসিবেলও ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা।

সমীক্ষার ফলে এমনও জানা গেছে, কোন ব্যক্তি দৈনিক ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা যদি ৮৫ ডেসিবেল তীব্র শব্দের মধ্যে কালযাপন করে তাহলে চল্লিশ বছরের মধ্যে তার দেহে ভর করবে নানা ব্যাধি এবং আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বধিরও হয়ে যাবে।

শব্দের এই ভয়ঙ্কর প্রভাবের কথা চিন্তা করে পৃথিবীর নানা দেশ নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যানবাহনপূর্ণ রাস্তাগুলির পাশে নির্মিত হয়েছে শব্দ নিরোধক বাড়ী। মোটর, লরী ইত্যাদির শব্দ মাত্রা যাতে ৮০ থেকে ৮৫ ডেসিবেলের মধ্যে থাকে তার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরাতন এবং ত্রুটিপূর্ণ সাইলেনসার যুক্ত গাড়ীকে বাতিল করার আইন জারি হয়েছে। গাড়ির হর্ণ যাতে মাত্রা ছাড়াতে না পারে তার জন্যও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির শব্দের মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

কারখানায় কারখানায়ও উচ্চশব্দ যাতে না উঠে তার জন্যও আছে কঠোর নিয়ম। এক্ষেত্রে ভারতেও নিয়ম প্রচলিত। তবে অন্যান্য দেশের মত শব্দ দূষণ এড়াতে ভারত ততখানি নিয়ম প্রয়োগ করেনি।

তবে একটা কথা, নিয়ম যতই হোক না কেন প্রতিপালন করা হয় তার কতটুকু! মানুষ সচেতন না হলে পদে পদেই নিয়ম ভাঙ্গবে। উক্ত কারণে আমাদের তরুণদেরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা যে যে এলাকায় বসবাস করেন, সেই সেই এলাকা যাতে অবাঞ্ছিত শব্দ দ্বারা দূষিত না হয় সেদিকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁদেরই। যাঁরা এ বিষয়ে কিছুই অবহিত নন, তাঁদের ভালভাবে বোঝাতে হবে, হৈ-হট্টগোল—জোরে মাইক বা স্টিরিও যাতে না চলে সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। মাইকের গান শুনতে কোন ক্ষতি নেই, তবে তীব্রতা না বাড়লেই হল।

তরুণরা যেহেতু সর্বকালের জাতির মেরুদণ্ড, তাই পরিবেশকে শুদ্ধ করার দায়িত্ব তাদেরই সর্বাধিক। আর তাদেরই সামনে পড়ে রয়েছে বিশাল ভবিষ্যৎ। নিজেদেরই স্বার্থে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তরুণরাই অবাঞ্ছিত শব্দ তথা জোরে জোরে মাইক বাজানো, পটকা ফাটানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। মনে হয় শব্দদূষণ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই বলেই উক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করে। সংঘ, ক্লাব ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের যদি অবহিত করানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই তারা সাবধান হবে এবং অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টিতে নিজেরাই বাধা প্রদান করবে।

সভ্যতার অন্যান্য উপাদান থেকে দূষণ

সুখের লাগিয়া "সভ্যতা গড়িনু
অনল উদ্‌গারি চলে।"

হাজার হাজার বছরের প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে মানব যেদিন বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে বন্দিনী করেছিল সেইদিনই সে দেখতে পেয়েছিল সুখের মুখ। সেই থেকে সে দুর্বার গতিতে কেবল এগিয়েই চলেছে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক যুগের একেবারে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে হয়ে উঠেছে তীব্র গতিশীল। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনেক আহরণ করেছে, জীবনযাত্রার মানও করেছে অনেক উন্নত। তাই অনিবার্যভাবে অতিরিক্ত সৌরভ-যুক্ত পুষ্পে অত্যধিক কীটের আক্রমণের মত মানব সভ্যতা আজ নানা সঙ্কটের সম্মুখীন।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ অনেক কিছু চিন্তা করেছে। সেই চাইছে সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধিকে জয় করতে, পরমায়ুকে বাড়াতে, নবজাতকের দেহ থেকে সমস্ত ত্রুটি দূরীকরণের মাধ্যমে প্রতিভাবান করে তুলতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপন অজান্তেই ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়ার মত নতুন নতুন ব্যাধির জন্মদান করে চলেছে, পরমায়ুকে ক্ষীণ করার ব্যবস্থা করছে এবং নবজাতককে পৃথিবীতে আনছে বিকলাঙ্গ করে। জ্ঞানদাসের সেই খেদোক্তি যেন "শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।"

অবশ্য এর জন্য বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাল-মন্দ নিয়ে জগৎ। অমৃতকে যেমন লাভ করা যায় তেমনই অমৃতের পাশাপাশি গরলও আত্মপ্রকাশ করে। অতএব অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করতে গেলে নীলকণ্ঠ হওয়ার কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে যত গরলের আমদানি হবে তাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বিন্দু-মাত্রও যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকতে পারে। অথবা সব সময় অমৃত-

টাকে গ্রহণ করে গরলটাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাওয়ার আনন্দে আমরা এত বিভোর হয়ে যাই, আলো দেখে এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং সৌন্দর্য দেখে এমন আকর্ষণ বোধ করি যে ভালমন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। অর্থাৎ সুন্দরের মধ্যে গরল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না। বিজ্ঞান যা কিছু দান করছে, সবকিছুকেই আমরা অমৃত হিসাবে মেনে নিচ্ছি। তাই আজ এমন সঙ্কট, বিজ্ঞানও আজ অভিশাপের নামান্তর।

দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে ধরা যাক রোগ নিরাময়ের জন্য আবিষ্কৃত ওষুধ সমূহকে। আজকাল এমন কিছু কিছু ওষুধ প্রস্তুত হচ্ছে, আফিং-মরফিন জাতীয় এমন সব উপক্ষার সংগ্রহ হচ্ছে, যার প্রভাবে রোগমুক্তি ঘটলেও এদের ক্রিয়া শরীরে দারুণ সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে জন্মদান করে বহু রোগের। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ওদের ব্যবহার বন্ধ করলে মানবদেহ এতখানি দূষিত হতে পারতো না।

অধিক ফলনের আশায় আমরা প্রয়োগ করে চলেছি এমন সব সার ও কীটনাশক ওষুধ—যার প্রভাব থেকে জল, বায়ু, মাটি কেউ রক্ষা পাচ্ছে না। এসব ওষুধের ব্যবহার আমরা বন্ধ করে দিতে পারি অথবা একেবারে সীমিত করতে পারি।

একই কথা বাজারের নানা মুখরোচক খাদ্য এবং প্রসাধন দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ব্যাপারে আমরা গতানুগতিক ব্যবস্থাকে মেনে নি, বিজ্ঞাপন দেখে গুণাগুণ বিচার করি, কিন্তু একবারও চিন্তা করি না এদের মধ্যে দোষত্রুটি কতখানি আছে।

প্রথমেই আমাদের অতি প্রিয় গুঁড়া দুধ, মাখন ইত্যাদির কথা ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞান মনে করে, যে যত ভাল জিনিস হোক না কেন শুকনো অবস্থায় ওর খাদ্যগুণ অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাছাড়া ওদের প্রস্তুতির ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হতে হয়। তার ফলে অতি অল্প হলেও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর—এমন কিছু কিছু অবাঞ্ছিত পদার্থ থেকে যায়। ওদের আবার সংরক্ষণ করতে

হয় টিনের তৈরি অথবা অন্য কোন ধাতব কৌটায়। তাই আপনা হতেই এসে পড়ে ধাতুর প্রভাব। টিন তো বিষাক্ত ধাতুদের মধ্যে একটি। এদিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম অনেকখানি নিরাপদ।

অনেকে বনস্পতি ব্যবহারে অভ্যস্ত। ওকে তৈরি করতে হয় উদ্ভিজ্জ তেলকে হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায়। যে সব সাবধানতা অবলম্বন করার কথা, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালিত হয় না। অপরদিকে যত সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন কিছু কিছু ক্ষতিকর প্রভাব অবশ্যই থেকে যায়—যা শরীরে মৃদু বিষক্রিয়া করে। এক কথায় সে আদৌ নির্দোষ নয়।

রঙিন খাদ্য ও পানীয় আমরা অনেকেই ভালবাসি। কিন্তু জানি কি, অধিকাংশ রঙ আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। খাদ্যে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তাদের প্রায় সবগুলিই আলকাতরার পাতনের ফলে প্রস্তুত। আর আলকাতরা থেকে জাত যে কোন রঙ শরীরের ক্ষতি আনাবেই।

কোথায় রঙ ব্যবহার করা হয় না? নানারকম মিষ্টি, বিস্কুট, কেক, আইসক্রিম, জেলি প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে পানের মশলা, ডাল, রান্নার জন্য হলুদ ইত্যাদি অনেক কিছুতে রঙ দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। যদিও খাদ্যদ্রব্যে রঙ ব্যবহার সম্বন্ধে সব দেশে কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে তবু সব ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি নিয়ম মেনে চলে না। আবার যে সব রঙের উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি সেগুলোও সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। আমরা নির্দ্বিধায় জিলিপি, বিস্কুট, জেলি ইত্যাদি মুখে পুরে ফেলি, ছেলের হাতে অসঙ্কোচে তুলে দিই, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না এদের মধ্যে পুষ্টিগুণ কতটুকু আছে? কিংবা শরীরের পক্ষে কতখানি কল্যাণকর কিংবা অকল্যাণকর। আমরা আবার ঘরে রান্নার ঝামেলা লাঘব করতে বাজারের খাদ্য কিনে খাই, মসলা পেষাইর কষ্ট দূর করতে গুঁড়া মশলা ব্যবহার করি, আর বিজ্ঞাপন দেখেই গুণাগুণ যাচাই করি।

আমরা সিগারেট টানি। যেখানে সেখানে সিগারেটের টুকরা

নিক্ষেপ করি। ওর ধোঁয়া বাতাসকে করে দূষিত। সিগারেটের নিকোটিন শুধু নিজের শরীরের ক্ষতিসাধন করে না, আমাদের সামনে ছোটরা যারা ঘুরছে অথবা পড়াশোনা করছে তাদের নাকে লেগেও ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে ক্লোরোবেঞ্জিন নামক উপাদান—যা অধূম পায়ীদের ও ক্যানসার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এবার আমাদের প্রসাধনের কথায় আসা যাক। রূপচর্চার জন্য এবং সখ-সৌখিনতার জন্য আমরা কত রকমের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার বিপদ যথেষ্ট। হয়তো অনেকে এখনই গোঁসা করে ফেলেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গায়ে মুখে যে সমস্ত পাউডারের প্রলেপ দেওয়া হয় তাতে কি জিঙ্কের লবণ মেশানো হয় না? ঐ জিঙ্ক নামক ধাতুটি কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? আর ঐ গুঁড়াগুলো নাকে প্রবেশ করে কি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে না? নেল পালিসে কি অ্যামারেন্থ নামক লাল রঙটি থাকে না! অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম যাঁরা ত্বকে ব্যবহার করেন তাঁদের ত্বক কি যাঁরা ব্যবহার করেন না তাঁদের ত্বক অপেক্ষা অধিক মসৃণ ও রোগমুক্ত? মূল্যবান ও ভিটামিনযুক্ত কেশ তৈল ব্যবহারে কি চুলের কোন ক্ষতি হয় না?

যে কোন সুগন্ধির উৎস রাসায়নিক উপাদান। সেন্ট সাবানের গন্ধ, কমলার গন্ধ কিংবা আনারসের গন্ধ, প্রভৃতি প্রকৃতি থেকে আহরণ করা হয় না। সবই রাসায়নিক যৌগ। এবং প্রত্যেকেরই আছে কিছু না কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

সুগন্ধি দ্রব্যের কথা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় রঙের কথায় ফিরে আসা যাক। খাদ্যে ও প্রসাধন সামগ্রীতে অ্যামারেন্থ নামে যে লাল রঙটি ব্যবহার করা হয় তার প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের উপরও পতিত হয়। অনেক সময় গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় এবং যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তারও নানারকম বিকৃতি থাকতে পারে। এমনকি মস্তিষ্কেরও ত্রুটি আনায়। আর আমরা খাদ্যে যে হলদে রঙগুলো ব্যবহার করি তাতে ক্যানসারও

হতে পারে। সুরমা, সিঁদুর ইত্যাদিতে থাকে সীসার লবণ। ঐ সীসা শরীরের পক্ষে একেবারে অবাঞ্ছিত ধাতু।

বিজ্ঞানের চরম উন্নতিতে পরিবেশ থেকে কিছু কিছু ধাতুও প্রবেশ করছে আমাদের দেহে। যেমন, সীসার পাইপের জল খাচ্ছি আর সীসার পাইপের অশুদ্ধি ক্যাডমিয়াম জলে দ্রবীভূত হয়ে চলে আসছে আমাদের দেহে। ফসফেট সারের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহ থেকেও আমাদের দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে ক্যাডমিয়াম। সীসা, তামা, দস্তা প্রভৃতির জিনিসপত্র আমরা প্রায়ই নাড়াচাড়া করছি। তাই অজ্ঞাতে এগুলোও জমা হচ্ছে শরীরে। উক্ত ধাতুগুলির প্রত্যেকটি বিষাক্ত। অনুপ্রবেশের পর দেহে মৃদু বিষক্রিয়া করতে থাকে। ফলে মস্তিষ্কের প্রদাহ, বহুমূত্র, লিভারের অসুখ, সন্ন্যাস, ক্যানসার প্রভৃতি রোগের কারণ হয়। রক্তের অন্যতম সংগঠক লোহার পরিমাণ বাড়াও দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। অথচ খরজলে, কোন কোন প্রস্রবণের জলে লোহার পরিমাণ বেশী থাকায় এবং লৌহপাত্রে পান ভোজনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মুক্ত লোহা সঞ্চিত হয়। যন্ত্রযুগে আমাদের শরীরটাও যদি যন্ত্রে পরিণত হতো তাহলে কথাই ছিল না। কিন্তু পুরোপুরি যান্ত্রিক হয়ে উঠেনি এখনও। তাই মাঝে মাঝে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ধাতুদের অতি অল্প পরিমাণে আধিক্য ঘটলেও বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞান সহজেই পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করে নিতে পারে এবং তার প্রতিষেধকও সরবরাহ করতে পারে।

সভ্যতার আর এক অভিশাপ আমাদের মুখের রুচির পরিবর্তন। বাজারের খাদ্যে যেন আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। টিন ও অন্যান্য ধাতুর তৈরি কৌটায় ভরা খাবার, রুটি-জ্যাম-জেলি-বিস্কুট, হোটেল রেস্তোরাঁর গুরুপাক খাদ্য যথেষ্ট রসনা তৃপ্তিকর। ঘরের খাবারকেও বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত করেছি। অতিরিক্ত তেল-মশলার সংযোগ, তেল-ঘি সহযোগে মাছ-মাংস-তরকারিকে অত্যধিক ভাজা, গভীরভাবে তরকারির খোসা ছাড়ানো ইত্যাদি আমাদের ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে আমরা কতকগুলি মূল্যবান খাদ্যপ্রাণকে নষ্ট করে ফেলি আর

তার ঘাটতি পূরণ করি বাজারের ওষুধ গিলে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা আজকাল খাদ্যকে খাচ্ছি না, খাদ্যই আমাদের খেয়ে ফেলছে।

অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য গ্রহণের ফলে পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ছে। আসছে অম্ল, অজীর্ণ আর ঐ অম্ল ও অজীর্ণ থেকে হৃদরোগ, কিডনীর গোলমাল পরিশেষে সন্ন্যাস।

যারা আছে "মাটির কাছাকাছি", গায়ে যাদের মাটির প্রলেপ পড়ছে দিবারাত্রি, বাজারের খাদ্য গ্রহণ যারা করতে পারে না, তারাই দীর্ঘায়ু ও নিরোগ। পাঁচ-পো চালের ভাত এবং পাঁচ-গণ্ডা পদকে অবলীলাক্রমে উদরসাৎ করেও থাকে দিব্যি নির্বিকার। আর আমরা অনেকে পঞ্চাশ গ্রাম চালের ভাত খেতেও অস্বস্তি অনুভব করি। বিজ্ঞান আজ আমাদের মাটির কাছ থেকে ক্রমশঃই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বিলাসী করে দিচ্ছে কিন্তু আয়াসী করছে না, সুখ দিয়েছে কিন্তু শান্তিকে কেড়ে নিয়েছে। এ আমাদেরই কেবল সচেতনতার অভাব।

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

"নব নবীনের গাহিয়া গান,
সজীব করিব মহাশ্মশান।.........

কথায় বলে, অর্থ বা সম্পদ আহরণ অপেক্ষা সংরক্ষণই অধিক কষ্টসাধ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। যাঁরা অর্থকে ঠিকমত ব্যয় করতে জানেন না তাঁদের কাছে অর্থ অনর্থের মূল। সেই অনর্থের আগুনে নিজেই কেবল ভস্মীভূত হন না আপন বংশধরদেরও ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যান।

এই একই কথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞান নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে নিত্যই বিতরণ করে চলেছে অজস্র সম্পদ। কেবলমাত্র ব্যবহারের দোষেই আমরা আমাদের বিপদকে ডেকে আনছি এবং সমগ্র পৃথিবীটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার আয়োজন করছি। বিজ্ঞানের করুণায় অনেক পেয়েছি আমরা। এমনকি অফুরন্ত শক্তিরও সন্ধানলাভ করেছি। কিন্তু লোভ, হিংসা, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে আমরা কেবল নিজেদের মধ্যে হানাহানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ অপপ্রয়োগ করছি বিজ্ঞানের।

বিজ্ঞানের দয়ায় আবার আমরা উদ্ধার করেছি আমাদের অতীত ইতিহাসখানা। জেনেছি, একই উৎস থেকে মানবজাতির আগমন। মহাকালের সিঁড়ি বেয়ে আরও উর্ধ্বে আরোহণ করলে দেখতে পাই, একটি বিশেষ জায়গায় জীব-উদ্ভিদ সব মিলেমিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। অথচ এই চরম সত্যটাকে উপলব্ধি করেও আমরা নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে এখনও আবদ্ধ করে রেখেছি নিজেদের। তাই আজও পরিত্যাগ করতে পারলাম না আমাদের অন্ধ সংস্কারগুলোকে, পরিত্যাগ করতে পারলাম না উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, মন থেকে মুছে

ফেলতে পারলাম না সাদা ও কালোর মধ্যে বিভেদ। এর চেয়ে চরম দুঃখের আর কি হতে পারে ?

বিজ্ঞান আমাদের আরও জানিয়েছে, পৃথিবীতে এককভাবে কারও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সবার মধ্যেই রয়েছে একটা যোগসূত্র। অর্থাৎ সবাই সবার প্রতিবেশী। তাই একের উন্নতি অপরের উন্নতির সহায়ক এবং একের ধ্বংসে অপরের বিলুপ্তির সম্ভাবনা। সত্যটি আবার সামান্য দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এই সত্যটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই বলে আমাদের মধ্যে এত হিংসা, দ্বেষ, মারামারি ও হানাহানি।

আবার প্রতিবেশী পরিবেশের দাস। সবার পরিবেশ শুদ্ধ থাকলে আমরাও সুস্থ থাকবো। এই হিসাবে মাটিতে বসবাসকারী অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া থেকে আরম্ভ করে তাবৎ যত গাছপালা, অরণ্যের হিংস্রজন্তু সবাই আমাদের প্রতিবেশী। কেননা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা সবাই সবার উপরে নির্ভর করে আছি।

এই উদ্দেশ্যে পরিবেশকে সুস্থ রাখতেই হবে অর্থাৎ অপরের উন্নতিতে যত্নবান হতে হবে। উদ্দেশ্যটিকে সফল করতে একক মানুষের অথবা একক কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা থেকে একজন সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবাই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। এই মুহূর্তে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেটি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং বিশ্ব সৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠা। পরিবেশ রূপান্তরের সবচেয়ে বড় ভয় ঐখানেই। ওর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না কেউই। জীব ও উদ্ভিদ সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, পৃথিবী পরিণত হবে এক তপ্ত মরুভূমিতে আর বিরাজ করবে গর্তবাসী ইঁদুর জাতীয় কিছু কিছু প্রাণী। হয়ত অবস্থা হবে মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষ অধ্যায়ের মত।

এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি দেশকে। দেশের অভ্যন্তরেও আরোপ করতে হবে নানা বিধিনিষেধ। অবাঞ্ছিত ধূলাবালি ও ধোঁয়া, বিবিধ

ক্ষতিকর গ্যাস ও আবর্জনা যাতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে না পারে, জলকে অপবিত্র করতে না পারে, মাটিকে বিষাক্ত করতে না পারে, তার জন্য কলকারখানা ও গাড়ীগুলির উপর কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। নিষিদ্ধ করতে হবে খাদ্যে ও প্রসাধন সামগ্রীতে রঙের ব্যবহার এবং কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর সার ও কীটনাশক ওষুধ।

দেশবাসীকে সচেতন করার দায়িত্বও সরকারের। দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলি এবং সাময়িক পত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে আরও জোরদার করতে হবে প্রচার। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে। জনবহুল এলাকাগুলিতে এবং ট্রেনে বাসে যাতে কেউ আবর্জনা, পানের পিক, ফলের ছোবড়া, খাদ্যকণা, পোড়া সিগারেট ইত্যাদি ফেলতে না পারে তার জন্য কঠোর আদেশ বলবৎ করা উচিত।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, আইনের দ্বারা খুব বেশী কিংবা সর্বক্ষেত্রে যে সুবিধা হয় এমন নয়। অনেকক্ষেত্রে উল্টো ফলও ফলে। তাই সচেতন হতে হবে জনসাধারণকে। যেখানে যে বা যারা নোংরামি করছে, কুঅভ্যাসের ফলে পরিবেশকে দূষিত করছে, তাদের প্রতিবেশীকেই ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে—যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে নোংরা করলে কেবল অপরের ক্ষতি হয় না তার নিজেরও ক্ষতি হয়। উক্ত চেতনাবোধ জাগরণের মূলে শাসন কিংবা কোন আইন কখনও কার্যকরী হতে পারে না।

সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কৃষকদেরও। তাঁরা যে সব সার ও ওষুধ ব্যবহার করবেন, তার গুণাগুণ একবার বিচার করে দেখবেন। অথবা কারও কাছ থেকে জেনে নেবেন। যাদের ক্ষতিকর প্রভাব আছে বলে মনে করবেন, তা যত উন্নত হোক না কেন দশের স্বার্থে পরিত্যাগ করবেন। কাছে পিঠে পানাপুকুর, পুকুরের পাড়ে গোয়াল ইত্যাদি রাখবেন না। আর উদ্ভিদদের বংশবিস্তারে সহায়তা করবেন। পোড়ো জায়গায় যে সব উদ্ভিদ জন্মায়, সে যদি ফণীমনসার মত গাছও হয় তাহলে তাকেও সংরক্ষণ করা উচিত। সরকারী বাঁধ, শ্মশান প্রভৃতি

পোড়ো জায়গায় আপনা হতে যে সব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের রক্ষা করতে হবে গরু ছাগলের মুখ থেকে।

তরুণদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পথেঘাটে আবর্জনা না জমে, উচ্চগ্রামে মাইক যেন কেউ না বাজায়, বোমা-পটকা ইত্যাদি যাতে না ফাটে। তাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের উদ্দেশ্য যেন কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, যেন সে বিজ্ঞান মানসিকতা গঠন করতে পারে এবং অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনও দেখা গেছে, বিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করেও অনেকে পালন করছেন নানা সংস্কার। সেই সংস্কারই আমাদের পরিবেশ দূষণের অন্যতম সহায়ক।

সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যদি এইভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা জাগরিত হয়, তাহলে পরিবেশ দূষণের ভয়াল রূপ অনেকখানি হ্রাস পেয়ে যাবে। সুন্দর হয়ে উঠবে আমাদের মাটির পৃথিবী, সুন্দর হবে তার জল-মাটি-হাওয়া-আকাশ, আর সুন্দর হয়ে উঠবো আমরাও। আজ বিজ্ঞানের কৃপায় সমগ্র পৃথিবী আমাদের একরকম হাতের মুঠোয় এসে গেছে। দেশ কালের গণ্ডী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা মানুষ জাতি পৃথিবীরই বাসিন্দা—এই মনোভাবের বশবর্তী কী হওয়া যায় না?

রাসায়নিক দূষণ

বর্তমানে মানুষের চাহিদার যেন শেষ নেই। একটি চাহিদার পূরণ হতে না হতে অন্য চাহিদা অনুভব করে। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলেছে। নানা ধরনের রঙ, মন-মাতানো সুগন্ধি দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, পেন্ট, বার্ণিশ, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে প্লাস্টিক, সেলুলয়েড, কৃত্রিম তন্তু, পলিথিন পর্যন্ত সবই প্রস্তুত হচ্ছে রাসায়নিক উপায়ে। ওষুধ তৈরি, বরফকল প্রভৃতিও রাসায়নিক শিল্পের আওতার বাহিরে নয়। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক—যা আজকের উন্নত ফসল ফলানোর হাতিয়ার, তাও রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। তার উপর ধাতু নিষ্কাশন এবং ধাতু থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাসায়নিক পদ্ধতিতেই হচ্ছে। এককথায় মানুষের চাহিদার অধিকাংশই পূরণ করছে রাসায়নিক শিল্প।

রাসায়নিক শিল্পস্থাপন কী হারে যে বেড়ে চলেছে তা একটা সমীক্ষা থেকে জানা যাবে। সমীক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, ১৯৫০ সালের দিকে রাসায়নিক পদার্থের মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ০·৭ কোটি টন। ১৯৭০ সালে সেই উৎপাদন বেড়ে হয়েছিল ৬ কোটি টনের মত। কিন্তু পরবর্তী পনের বছরে বেড়ে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে মোট উৎপাদন হয়েছে ২৫ কোটি টন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই হারে উৎপাদন বাড়তে বাড়তে ২০০০ সালে হয়ত ১০০ কোটি টনে গিয়ে ঠেকবে।

আর একটি সমীক্ষা থেকে ঐ রাসায়নিক পদার্থগুলি থেকে যে পরিমাণ দূষণ হচ্ছে তাও জানা গেছে। কথিত আছে, ১৯৭০ সালে যে ৬ কোটি টন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছিল তার মধ্যে বায়ু দূষণ ঘটিয়েছিল ২ কোটি টন, বাদবাকী ৪ কোটি টন জল ও মাটিকে বিষিয়েছিল।

রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে সবচেয়ে বেশী দূষিত হয়ে উঠে স্থানীয় পরিবেশ। আর যাঁরা সেইসব কারখানায় কাজ করেন তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রচণ্ড পরিমাণে। অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং দুর্ঘটনার ফলে প্রাণহানি ঘটে বহু সংখ্যক কর্মীর। ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইডের কীটনাশক উৎপাদনের কারখানা যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সে কাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে। এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ছাড়াও ছোট ছোট দুর্ঘটনা প্রায়ই লেগে আছে।

এমনিতে রাসায়নিক কারখানাগুলো থেকে ছড়াচ্ছে কতকগুলো ক্ষতিকর গ্যাস, নানা ধরনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাতব ও অধাতব কণা। এগুলির সবই মানবদেহের পক্ষে অনিষ্টকর।

অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন, ধাতুরা শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। মানুষের দেহে যদিও কোন কোন ধাতু ট্রেন এলিমেণ্ট হিসেবে রয়েছে তবু সহ্যসীমার বাহিরে প্রতিটি ধাতুই ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে শরীরের। প্রথমে মৃদু বিষক্রিয়া, পরে জীবন নিয়ে টানাটানি। আর্সেনিক তো একেবারে কাঁচা বিষ। এখানে এনভায়রণ-মেণ্ট প্রোটেকশনে এজেন্সি বা সংক্ষেপে ই. পি. এ. প্রাণীদেহের পক্ষে ক্ষতিকর ধাতু, প্রতি ঘনমিটারে কত মিলিগ্রাম থাকলে সহ্যসীমার মধ্যে থাকে এবং তার বেশী হলে কী ক্ষতি হয় তার একটা তালিকা দিয়েছেন। সহ্য সীমার ভেতরে মিলিগ্রাম/ঘনমিটারকে একটি এককও ধরেছেন তাঁরা। এই এককটিকে বলা হয় থ্রেশোল্ড লিমিট ভ্যালু বা সংক্ষেপে T. L. V।

পদার্থ	সহ্যসীমা T. L. V. এককে	সহ্যসীমার বাহিরে ক্ষতিকর প্রভাব
ক্যাডমিয়াম	০·১—০·২	গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি, হাড় ও মূত্রনালীর রোগ।
ভ্যানাডিয়াম	০·০৫—০ ৫	ক্যাডমিয়ামের মত।

পদার্থ	সহ্যসীমা T. L. V. এককে	সহ্যসীমার বাহিরে ক্ষতিকর প্রভাব
ম্যাঙ্গানিজ	৫·০	ক্যাডমিয়ামের মত।
আর্সেনিক	০·১	ফুসফুস ও যকৃতের ক্যান্সার।
পারদ	০·০১—০·০৫	পেটের গোলমাল, চর্মরোগ ও স্নায়ুর রোগ।
নিকেল	ধাতু হিসাবে ১·০ $Ni(Co)_4$ হিসাবে ০·০০১	ক্যান্সার। $Ni(Co)_4$-র ক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।
সীসা	০·১৫	শিশুদের বেশী ক্ষতি এবং অল্পদিনে মারা যায়। বয়স্কদের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও পরিণামে মৃত্যু।

মানবসৃষ্ট পদার্থ ছাড়াও প্রকৃতি থেকে কিছু কিছু বিষাক্ত দ্রব্য আপনা হতে আবার বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে। এদের মধ্যে সিলিকা ও অ্যাসবেসটাস প্রধান। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মুক্তির ক্ষেত্রে মানুষেরও হাত আছে। বিশেষ করে অ্যাসবেসটাসযুক্ত ও সিলিকাযুক্ত শিলাস্তর কাটতে গেলে এরা মুক্ত হয় বেশী পরিমাণে। ফলে শ্রমিকেরা এর পাল্লায় পড়ে এবং অল্পদিনে মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভাগ্য এই যে, সব জেনেশুনেও অজ্ঞ শ্রমিকদের না জানিয়ে এবং অধিক পয়সার লোভ দেখিয়ে এই জাতীয় শিলাস্তর কাটতে প্রলুব্ধ করা হয়।

দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, আজকাল যে হারে রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন বেড়ে চলেছে সেই হারে বেড়ে চলেছে দুর্ঘটনা। প্রায়ই শোনা যায় বরফকল, সার তৈরির কারখানা প্রভৃতি থেকে অসাবধানতাবশতঃ অ্যামোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে এবং বহু লোককে অসুস্থ হতে। বহু দেশে বড় বড় দুর্ঘটনাও ঘটছে। সাম্প্রতিক কালের

ভূপালের কীটনাশক তৈরির কারখানার দুর্ঘটনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলে পারমাণবিক চুল্লীর দ্বারা দুর্ঘটনা যেমনই মর্মান্তিক তেমনই ভয়াবহ।

ভূপালের দুর্ঘটনাটিকে অনেকে এক কলঙ্কময় নজির হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। ভারতে কীটনাশকের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলায় বিদেশী এক বাণিজ্য সংস্থার (আমেরিকার আধুনিকতম শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন কারবাইড) উদ্যোগে ভূপালে স্থাপিত হয়েছিল সেভিন ও কীটনাশক তথা পেস্টিসাইড তৈরির কারখানা। এগুলি তৈরির সাধারণ পদ্ধতি হল, প্রথম পর্যায়ে কার্বন-মন-অক্সাইডের (CO) সঙ্গে ক্লোরিনকে (Cl_2) যুক্ত করিয়ে ফসজেন তৈরি করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফসজেনের সঙ্গে মিথাইল অ্যামাইন সংযুক্ত করা হয়, ফলে উৎপন্ন হয় মিথাইল আইসোসায়নেট তথা সংক্ষেপে মিক (MIC)। তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে মিকের সঙ্গে আলফা ন্যাপথলের বিক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয় সেভিন।

ফসজেন গ্যাসটি অতিমাত্রায় বিষাক্ত। মিকের ক্ষতিকর মাত্রা কতখানি—তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও প্রমাণিত হয়েছে, জলের সঙ্গে ক্রিয়ায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিকর হয়ে উঠে। অপরদিকে ফসজেন ও মিক দুটি গ্যাস যদি বাতাসে মিশে তাহলে সেখানকার বায়ুকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিষিয়ে দেয়।

ভূপালে গভীর রাত্রিতে অসাবধানতাবশতঃ ট্যাঙ্ক থেকে ঐ বিষাক্ত মিক গ্যাসই বেরিয়ে এসেছিল। অতি অল্প সময়ের ভেতরেই চল্লিশ বর্গমিটার এলাকার বায়ুকে দূষিত করে ফেলেছিল। ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই ঘুম আর ভাঙ্গেনি। একেবারে চিরঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। যাদের ঘুম ভেঙ্গেছিল তারা উঠে পড়তেই দেখে সর্বাঙ্গে ভয়ঙ্কর জ্বালা, শ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট। সেই রাতেই একটু শ্বাস নিতে তারা দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে শুরু করে—এমনকি কুকুর, বেড়াল এবং পাখীরাও। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালো প্রায় দু-হাজার মানুষ আর প্রায় বিশ হাজারের মত লোককে হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হল। শেষোক্তদের মধ্যেও অনেককে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আরও আশ্চর্যের কথা, সেই দুর্ঘটনার জের এখনও চলছে এবং দীর্ঘকাল ধরে থাকবেও। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গীরণ অপেক্ষাও যেন ভয়াবহ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলের ঘটনাটা ঘটেছিল পারমাণবিক চুল্লী থেকে অসাবধানতায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে। হতাহতের পরিমাণ সঠিক জানা যায়নি তবে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত।

রাসায়নিক দূষণের ফলে আরও কত ভয়াবহ ঘটনা অতীতে ঘটেছে। তাদের মধ্যে একটি হল, ১৯৬৯ সালে ইরাকের ভয়াবহ রাসায়নিক দূষণ। অসাবধানতাবশতঃ কিছু সার মিথাইল মার্কারীর দ্বারা দূষিত হয়েছিল। সেই সারকে প্রয়োগ করা হয়েছিল কিছু কিছু গমের ক্ষেতে। ফলে সমস্ত ফসলটাই দূষিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জানতে পারেনি কেউ। ঐ গমের রুটি যারাই খেয়েছিল তারা সবাই পতিত হয়েছিল মৃত্যুমুখে। কয়েক হাজার লোক এইভাবে বলি হয়েছিল রাসায়নিক দূষণে। আর আশ্চর্যের কথা, সারের সঙ্গে অল্প-স্বল্পই মিশেছিল। অথচ সেই বিষ সার থেকে গম গাছ ও পরিশেষে গমেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল জাপানে। একটি উপসাগরের জলে রাসায়নিক দূষণ ঘটেছিল। সেই উপসাগরের মাছ যারাই খেয়েছিল তাদের সবাইকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এমনকি বেড়ালরাও বাদ যায়নি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, রাসায়নিক দূষণের ফলে এককালে সহস্র সহস্র মানুষের জীবনহানি ঘটে। কারখানার কর্মীদের উপর যেন সবসময় খাঁড়া ঝুলেই আছে। একটু অসতর্ক হলেই সর্বনাশ। তাছাড়া যাঁরা অতি বিষাক্ত দ্রব্যগুলিকে নিয়ে কাজ করেন দুর্ঘটনা না ঘটলেও জীবনকাল ক্ষীণ হয়ে আসে। মানুষের চাহিদা মেটানো এবং লাভজনক ব্যবসায় নামা চিরকাল অব্যাহত থাকবে, ক্রমান্বয়ে বেড়েও চলবে। এক্ষেত্রে একমাত্র সচেতনতা ও সাবধানতা ছাড়া কোন উপায়

নেই। কারখানার মালিকদের সাবধানতা ও কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ মনোভাব থাকলে, অর্থাৎ কেবল মুনাফার দিকে না তাকিয়ে মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হলে বহু দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে মানুষ।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে-সব রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব বেশী সেগুলো যেন ব্যবহৃত না হয়। আর যে-সব রাসায়নিক শিল্পে পারদ, সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সেখানে ঐ বিষাক্ত ধাতুদের যেন বহিঃরাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আবদ্ধ রাখা হয়। বহিঃরাসায়নিক পদার্থগুলি সাধারণতঃ ইথিলিন ডাই অ্যামাইন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ডি-পেনিসিলামিন ইত্যাদি। মুক্ত বিষাক্ত ধাতুগুলির সঙ্গে এরা বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক জটিল যৌগ তথা "চিলেট রিং" তৈরি করে।

সর্বসাধারণের আরও অবহিত হতে হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ রাসায়নিক দূষণের শিকার হলে, যেমন বিষাক্ত ধাতু, বিষাক্ত গ্যাস, বিষাক্ত কোন কীটনাশক খেয়ে ফেললে একটি সার্বজনীন প্রতিষেধক যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়; কিংবা একটুও দেরি না করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সার্বজনীন প্রতিষেধকটির কথা "সবুজ বিপ্লবের ফলে দূষণ" অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সবুজ বিপ্লবের ফলে দূষণ

সবুজ বিপ্লবের মূলে একটা বিশেষ কারণ আছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকায় মানুষের খাদ্যে টান পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে বহু সমস্যা জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে খাদ্য-সমস্যা একটা বড় সমস্যারূপে প্রকট হয়ে উঠে। ঠিক সেইসময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামনে "সবুজ বিপ্লব" বা "গ্রীন রিভোল্যুশন" কথাটি ফলাও ভাবে প্রচার করে। উল্লেখ করে, উন্নত বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ও কীটনাশক যথাযথভাবে ব্যবহার করলে এবং উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা থাকলে একই জমি থেকে বছরে একাধিকবার ফসল তোলা যায় এবং উক্ত ব্যবস্থায় ফলনও চতুর্গুণ।

অনেকের মতে আমেরিকার উক্ত মনোভাবের পেছনে পাকা ব্যবসায়ী-বুদ্ধি ছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণ এবং তাদের উপর খবরদারি করতে আমেরিকা নাকি প্রচুর অর্থব্যয়ে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক আবিষ্কার করেছিল।

যাই হোক, খাদ্য-সমস্যা নিয়ে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের সমূহদেশ যখন হিমসিম খাচ্ছিল তখন আমেরিকার ঐ টোপটি কোন ভাবনা-চিন্তা না করেই গ্রহণ করেছিল। ওর পেছনে কোন গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা, কিংবা সার ও কীটনাশকের কোন বিরুদ্ধ ক্রিয়া আছে কিনা—তা ভাববার অবকাশ পায়নি। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিদেশীদের আবিষ্কারকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ ভেবে কৃষকদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল। তবে আমেরিকা ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রচুর খাদ্যশস্য ফলালেও পরের দিকে ডি. ডি. টি প্রভৃতির ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা জেনে ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে সাবধান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কিছু কিছু সমালোচকের মতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কীটনাশকের মাধ্যমে মৃদু বিষক্রিয়া

ঘটিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়ার গোপন অভিসন্ধিও ছিল।

ওদের মনোভাব যাই থাক না কেন, অশিক্ষিত ও নিরন্ন কৃষক-সম্প্রদায় সার, কীটনাশক, পাম্পিংসেট হাতের কাছে পেয়ে একেবারে লুফে নিয়েছিল। বর্তমানে ঐ ব্যবস্থা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং নির্বিচারে ব্যবহৃত হচ্ছে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার।

অপরাপর দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদের ভারতবর্ষের কথায় আসা যেতে পারে। ভারতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। আশাতীত ফলন হওয়ায় সরকারী প্রচেষ্টায় অতি অল্পকালের ভেতরেই সারাদেশের কৃষি এলাকাগুলিতে যেন প্রচণ্ডভাবে সাড়া পড়ে যায়। হু-হু করে বাড়তে থাকে সেচ এলাকা এবং পাম্পসেট, ট্রাকটর, উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার।

১৯৬৬ সালের পর থেকে দেশে সেচ এলাকা বেড়ে প্রায় দেড়গুণ হয়েছে। পাম্পসেটের সংখ্যা ৭ গুণ, ট্রাকটরের সংখ্যা ৯ গুণ এবং কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০ গুণ। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বর্তমানে গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রতি বছর ব্যবহার করা হচ্ছে ৫০ কিলোগ্রামের মত সার। আর কীটনাশক? বর্তমানে সারাদেশে প্রতি বছর জমিতে ঢালা হচ্ছে ৭০ হাজার টনের মত।

পাম্পসেট ও ট্রাকটর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার ফলে কার্বন মন-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ধোঁয়া ইত্যাদি বহুল পরিমাণে বাতাসে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে দরিদ্র কৃষিজীবীরা কম দামের পুরানো পাম্পসেট কিনছেন। অথচ তাঁরা জানেন না, মেসিন যত পুরানো হয় ততই বেশী ঢালে বিষাক্ত কার্বন মন-অক্সাইড গ্যাস। আর কীটনাশকের বিষে অধিকাংশ মাটি ও জল দূষণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে।

শহর অপেক্ষা বর্তমানে পল্লীঅঞ্চলই কীটনাশকের বিষে অধিক জর্জরিত বলা যায়। শহরে অবশ্য এগুলি তৈরি হয় এবং তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনও করা হয়। মাঝে মাঝে যদিও অসতর্কতার

ফলে ভূপালের মত দুর্ঘটনা ঘটে—এবং সেই দুর্ঘটনা সবারই চোখে পড়ে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে যে মৃদু মৃদু বিষক্রিয়া হচ্ছে এবং বিষক্রিয়া সঞ্চারিত হচ্ছে শহরে সে-খবর বড় একটা কেউ রাখেন না। একটা দুর্ঘটনায় কয়েক সহস্র লোক মারা যাচ্ছেন বটে, কিন্তু মৃদু বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে সমগ্র জাতিটাই।

পল্লী অঞ্চলের কথাটাই প্রথমে ধরা যাক। কেবল ধান ও গমের ক্ষেত্রে নয়, সজী চাষেও সার ও কীটনাশক অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষকদের বসতবাটির চারদিকে যে-সব ছোট ছোট সজীর ক্ষেত আছে তাতে মাসে অন্তত দুবার ছড়ানো হয় কীটনাশক। কোন কোন সজীতে আবার প্রতি সপ্তাহে একবার বা দুবারও ছড়াতে হয়। এর ফলে বছরের অধিকাংশ দিন বিদঘুটে এক গন্ধে ভরপুর হয়ে থাকে পল্লীর বাতাস। অপরপক্ষে যে-সব কৃষক কীটনাশক ছড়িয়ে থাকেন তাঁরাও ততটা সাবধানতা অবলম্বন করেন না। এতে কৃষক নিজে আবার ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হন কীটনাশকের দ্বারা।

কীটনাশকের দৌরাত্ম্যে শুধু বাতাস নয়, জল ও মাটিও দূষিত। আজ পল্লী অঞ্চলের এমন কোন জলাধার নেই যেখানে কীটনাশকের অবশেষ নেই। এমন কোন জায়গার মাটি নেই যেখানে সার ও কীটনাশকের কোন ক্রিয়া হয়নি। অথচ এমন বহু সার ও কীটনাশক আছে যারা মাটিতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছরকাল ধরে প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

উপরোক্ত কারণে পল্লীর পরিবারগুলি নানা অসুখে ভুগছেন। প্রতিটি পরিবারে পেটের রোগ বাঁধা। অধিকাংশ মানুষকে বছরে কয়েকবার আমাশয় ও উদরাময়ে ভুগতে হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া পড়ছে গবাদি পশুর উপরেও। ক্রিয়া নষ্ট হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে অনেক সময় কোনপ্রকারে ছাড়া পেলে গবাদি পশুরা কীটনাশক প্রয়োগ করা ফসলে মুখ দেয়। ওতে পশুটি অনেক সময় মারাও যায়। গর্ভবতী কোন গাভী মুখ দিলে গাভীটি হয়ত বেঁচে যায়, কিন্তু বাছুরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃত শাবক প্রসব করে, কিংবা জন্মের কয়েকদিনের ভেতরেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় বাছুরটি।

ক্রমাগত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে বহু কীটপতঙ্গ বর্তমানে সহনশীলতাও অর্জন করে নিয়েছে। ওদের দেহের গঠন সরল, মেরুদণ্ডীদের মত দেহে এতসব যন্ত্রপাতি নেই। উক্ত কারণে তীব্র বিষাক্ত পদার্থকেও ওদের বংশধারা সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

এর ফলও হয়েছে ভয়াবহ। তীব্র থেকে তীব্রতর কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। মশা প্রভৃতি কতকগুলো ক্ষতিকর পতঙ্গ সহনশীলতা অর্জন করে নেওয়ায় তাদের দ্বারা বাহিত ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন রোগের জীবাণু সাধারণ প্রতিষেধকের দ্বারা প্রশমিত হচ্ছে না। কিছু কিছু জটিল রোগও দেখা দিচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ মাটিতে বসবাসকারী কেঁচো জাতীয় প্রাণী এবং উপকারী ব্যাক্টিরিয়ারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ কেঁচোর দ্বারা মাটি কর্ষিত হয়ে আলো-হাওয়া প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না এবং বাতাস থেকে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে যৌগের আকারে যে-সব নাইট্রোজেন নেমে আসছে তাদের উদ্ভিদের খাদ্যরূপে পরিবর্তিত করতে পারছে না ব্যাক্টিরিয়ারা।

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ কীটনাশক ক্লোরিনঘটিত হওয়ায় কিছু কিছু মুক্ত ক্লোরিন গ্যাস বাতাসে অনুপ্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে এবং বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরের ওজোনমণ্ডলকে আঘাত করছে। এর জন্য ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে আসার সুযোগ পাচ্ছে।

চতুর্থতঃ কতকগুলো বিষাক্ত কীটনাশক ছড়িয়ে কৃষকেরা অস্বস্তি বোধ করছেন, অসাবধানতাবশত মুখে হাত লেগে গেলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে এবং কোন সময়ে পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হলে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

পঞ্চমতঃ ঐ কীটনাশকের অবশেষ জমছে পুকুরে ও নদীর মাছের দেহে, গবাদি পশুর দেহে, হাঁস-মুরগীর দেহে এবং সব্জী ও ফসলে। আর এগুলি পল্লী অঞ্চল থেকে চালান যাচ্ছে শহরে। বিভিন্ন সমীক্ষক দল বিভিন্ন সময়ে শহর ও গ্রামের বাজারগুলির শাক-সব্জী, মাছ-মাংস, চাল-আটা প্রভৃতিকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সবার মধ্যে

পেয়েছেন বিযাক্ত কীটনাশকের অবশেষ। ধারণা করা হচ্ছে, এইভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে রোগে রোগে ছেয়ে যাবে দেশ এবং নবজাতকদের মস্তিষ্ক সুগঠিত হবে না। প্রতিভার অবক্ষয়ের ফলে জাতির বুকে অন্ধকার নেমে আসবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিটি দেশে খাদ্যের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাই সবুজ বিপ্লবকে দূরে সরিয়ে রাখাও যায় না। এক্ষেত্রে দেশীয় আবহাওয়ায় যে-সব দেশীয় বীজ থেকে ভাল ফসল পাওয়া যায় তাদেরই গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করতে হবে। তাহলে এত কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে ক্ষতিকর কীটনাশকগুলিকে একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে এবং নতুন নতুন ও অল্প ক্ষতিকর কীটনাশক আবিষ্কারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ কবতে হবে। রাসায়নিক সার বেশী প্রয়োগ না করে ঝোঁক দিতে হবে জৈব সার প্রয়োগের প্রতি।

জৈব সারের উৎস অবশ্য কম নেই। শহরের নর্দমাবাহিত পাঁককে সারে রূপান্তরিতকরণ, প্রাণীর মলমূত্রকে কাজে লাগাতে বায়োগ্যাস-প্ল্যান্ট স্থাপন, ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত বর্তমান পরিস্থিতিতে রাসায়নিক দূষণে ও কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই পতিত হচ্ছেন এবং অনেক দুর্ঘটনাও ঘটছে। একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচা যায়। দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিকে অর্থাৎ যদি কোনও প্রকারে কোন রাসায়নিক বিষ ব্যক্তিটির পেটে যায় তাহলে সর্বাগ্রে তাঁর বমনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে কাঁচা ডিম খাওয়ানোও চলতে পারে। এছাড়া একটা সার্বজনীন প্রতিষেধকও হাতের কাছে তৈরি করে রাখা যেতে পারে। সমপরিমাণ (১) নুন, (২) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, (৩) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, (৪) সোডিয়াম সালফেট, (৫) কাঠকয়লার গুঁড়ো ও (৬) ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে নিয়ে উত্তমরূপে মিশ্রিত করে সার্বজনীন প্রতিষেধকটি তৈরি করতে হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঐ মিশ্রণের মাত্র চা চামচের দু-চামচ নিয়ে এক কাপ জলে গুলে খাইয়ে দিতে হয়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করতে

হয় হাসপাতালে। যদি মৃদু বিষক্রিয়া হয় তাহলে ওতেই কাজ হবে।

কীটনাশক জলে, মাটিতে ও বাতাসে মেশার ফলে মনুষ্যদেহে সেগুলি কীভাবে সঞ্চিত হচ্ছে এবং তার ফল কী হচ্ছে তার একটা সারণী প্রস্তুত করা গেল।

কীটনাশক প্রয়োগে দূষণ	মানবদেহে যেভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে	মানবদেহে প্রতিক্রিয়া
জলসহ জলচর জীব ও জলজ উদ্ভিদ	(১) জলের মাধ্যমে (২) মাছ-কাঁকড়ার মাধ্যমে (৩) কলমী, শুশনী, হিঞ্চে প্রভৃতি শাকের মাধ্যমে	(১) স্নায়ুর রোগ (২) শ্বাসযন্ত্রের রোগ (৩) আন্ত্রিক রোগসমূহ (৪) ক্যানসার (৫) পক্ষাঘাত (৬) চোখের রোগ (৭) মস্তিষ্ক ও লিভারের রোগ
বায়ু ও উর্ধ্বাঞ্চলের ওজোনের স্তর	(১) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে (২) মহাকাশ থেকে আগত ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে	
মাটি ও মাটির উপর সমূহ গাছপালা ও পশুপাখী	(১) শাকসব্জীর মাধ্যমে (২) খাদ্যশস্যের মাধ্যমে (৩) দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের মাধ্যমে	

মানুষের সামাজিক পরিবেশ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, ভৌত ও জৈব পরিবেশ ছাড়াও মানুষের উপর আর এক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সে পরিবেশ তার সামাজিক পরিবেশ। ভৌত ও জৈব পরিবেশের দূষণে মানুষের অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা, আর সামাজিক পরিবেশ দূষণে মানুষের আচরণ বন্য পশুর পর্যায়ে নেমে যায়।

সামাজিক পরিবেশটাকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়। পারিবারিক এবং পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর মানবসমাজের।

পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। যদি পরিবারের মধ্যে সব সময় খিটিমিটি লেগে থাকে তাহলে তার ফল হয় বড় বিষময়। এমনিতে জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে মা-বাবা প্রভৃতি সবাইকে রোজগারের পেছনে ছুটতে হয়। তার উপর তুচ্ছ কোন কিছুকে অবলম্বন করে যদি ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয় তাহলে শান্তি বলতে কিছুই থাকে না। আর বড়রা যদি খিটখিটে ও বদমেজাজী হয় তাহলে তাঁদের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে পরিবারের শিশুদের উপর। আর এই শিশুরা যখন বড় হয়ে উঠে তখন তাদের আচরণ হয় ঐ বড়দের মতই।

আজকের নানা সমস্যা জর্জরিত পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্তত শিশুদের দিকে তাকিয়ে মনে রাখতে হবে যেন পারিবারিক শান্তি কিছুতেই ব্যাহত না হয়। যৌথ পরিবারে বাস করতে হলে বয়স্কদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, হাতের পাঁচটে আঙুল সমান হয় না। ভালো খারাপ দুই-ই থাকবে। তার উপর মনে রাখতে হবে, দুটি মানুষ দেখতে যেমন এক হয় না তেমনই দুজন মানুষের মনও কখনও সমান হতে পারে না। অর্থাৎ নিজের যেমনটি মনোভাব ঠিক সেই ধরনের মনোভাব একেবারে নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অল্পবিস্তর তফাৎ থাকবেই। আর এই কথাটি জানা থাকলে মনে হয় অনেকখানি পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হতো। আজকের কোন কোন পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝে যে-সব দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে তার মূলেই আছে ভুল বোঝাবুঝি, অল্প কোনকিছু অবলম্বনে অধিক চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ, নিজের আধিপত্য জাহির, ইত্যাদি। পরিবারের কারও আচরণ যদি অসঙ্গত বলে মনে হয় তাহলে ধৈর্য-সমহারে তার আচরণের কারণ অনুসন্ধান করলে বা সহানুভূতির সঙ্গে তার মনের কথা জানবার চেষ্টা করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে।

অপরপক্ষে পরিবারের মধ্যে খিটখিটে ও বদমেজাজী যাঁরা—তাঁরা একপ্রকার মানসিক রোগে ভোগেন। হয়ত ঐ রোগটা উৎপন্ন হয়েছে বাহির থেকে কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে, বা মাতৃগর্ভে থাকাকালে মস্তিষ্ক সুগঠিত না হওয়ার ফলে, কিংবা কোন-প্রকার হতাশায়, অথবা কোন না কোন কমপ্লেক্সে ভোগার ফলে। পরিবারের অন্যান্যদের খোঁজা উচিত, তাঁর অনুরূপ আচরণের উৎস কোথায়? একে কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকলে একদিন পরিবারের কেউ না কেউ আত্মহত্যার মত জঘন্য কর্মেও লিপ্ত হতে পারে। কমপ্লেক্সের ফলে আবেগ, আবেগের ফলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ নানা গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ—পরিশেষে তীব্র আবেগ এবং আত্মহত্যায় প্ররোচিত হওয়া বা অপরকে হত্যা করা। আজকের পরিবারে পরিবারে এত যে আত্মহত্যা, বধূ-হত্যা, বধূ-নির্যাতন, সন্তান-সন্ততিদের হত্যা ও পরে আত্মহত্যা ইত্যাদির মূলে আছে হতাশা, আবেগ, ভুল বোঝাবুঝি প্রভৃতি। একটু সচেতন হতে পারলে বা হঠাৎ ক্রুদ্ধ না হয়ে সংযত করতে পারলে পারিবারিক পরিবেশ অনেক সুন্দর হতে পারে।

পরিবারের বাহিরে পরিবেশের যে লোকজন তারাই সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখা দরকার যে, মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সমাজে তার একক কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজের স্বার্থই তার স্বার্থ, সমাজের রীতিনীতিই তার নিজস্ব রীতিনীতি। ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান, আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার

অভ্যাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি নিয়ম-কানুন—তারই নিয়ম-কানুন। প্রতিটি নিয়ম-কানুন তার মেনে চলা উচিত এবং নিয়ম ভাঙলে দুষ্কৃতকারীর পর্যায়ে পড়ে মানুষ। আর এগুলি যাঁরা অনুসরণ করেন এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করেন, তাঁরাই প্রকৃত সমাজহিতৈষী।

যেহেতু সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সবার গাঁটছড়া বাঁধা, তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যেকের যেন আত্মার আত্মীয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরও করে আছে। কৃষক, জেলে, মুচি, মেথর, ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কোন একজনকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। অথচ এই সহজ কথাটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। শক্তির অহঙ্কারে যেন মত্ত হয়ে থাকি, কখনও বা স্বার্থের লালসায় বিস্মৃত হয়ে যাই, আবার কখনও নিজেকে জাহির করতে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করি।

সত্য বলতে কি, মানুষের সমাজব্যবস্থা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এর মূলে আছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। গড়ে উঠেছে "শোষক" ও "শোষিত" দুটি সম্প্রদায়। আর এরই বিষময় ফল বিভেদ, দুর্নীতি, বিপ্লব, হানাহানি, রক্তারক্তি ইত্যাদি। এই ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যেদিন মানুষ আরণ্যক জীবন পরিত্যাগ করে নগর জীবনের পত্তন করেছিল সেইদিনই হয়েছিল এর অশুভ সূচনা। আজ মানব-সভ্যতার চরম উন্নতির দিনেও মানুষ সেই প্রাচীন মনোভাবকে আঁকড়ে বসে আছে, এইটিই আশ্চর্য! পৃথিবীর এত রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রাম ঘটতে দেখেও বিভেদ টিকিয়ে রাখা, এও এক বিস্ময়!

আজকের পরিবেশ-সংক্রান্ত এত যে ভাবনা-চিন্তা, এত রাসায়নিক দূষণ, এত দুর্ঘটনা, জল-বাতাসে-মাটিতে যে এত বিষ এর মূলেও পরোক্ষ-ভাবে কাজ করছে কিছু কিছু অধিক মুনাফালোভী মানুষের অসামাজিক আচরণ। মুনাফা লুটতে গিয়ে কারখানায় কারখানায় যে-সব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত—তা তাঁরা করছেন না, ভেজাল দিতেও

দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু একবারও ভেবে দেখছেন না, যে বিষ তারা ছড়িয়ে চলেছেন শত সতর্কতা অবলম্বনসত্ত্বেও সে-বিষ ফিরে যাচ্ছে তাঁদেরও কাছে।

বর্তমানে মানবসমাজ যে জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে তাতে সর্বস্তরের মানুষের সুস্থ চিন্তা ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিভেদ-বৈষম্য পরিত্যাগ করে, স্বার্থপর মনোভাবকে বিসর্জন দিয়ে, আগে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের। মনে রাখা উচিত, যার যত ক্ষমতা থাকুক না কেন কিংবা যত বুদ্ধিমান হোক না কেন প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের কাছে একক কারও অস্তিত্ব টিঁকে থাকে না। যদি হতো তাহলে এতবড় শক্তিশালী ডাইনোসোরদের অবলুপ্ত হতে হতো না। অথচ পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ায়, চাহিদা অল্প থাকায়, কঠোর পরিশ্রমী হওয়ায় এবং দলবদ্ধ হয়ে বাস করায় অতি ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীদের হয়েছে বাড়-বাড়ন্ত। তাদেরই বংশধর আজ মানুষ। অথচ প্রবল পরাক্রান্তরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে না চলায় একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নারী-পুরুষ, শক্তিমান-শক্তিহীন, ছোট-বড় ইত্যাদির বিভেদ না থাকায়, স্বার্থচিন্তা মনে ঠাঁই না পাওয়ায়, সঞ্চয়ের কথা না ভাবায় এবং শত শত মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে থাকায় দৈত্যসদৃশ ভয়ঙ্কর সব হিংস্রজন্তুর মধ্যেও কোন অসুবিধা অনুভব করেনি। উক্ত মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেছিল বলেই মানুষ জাতটা টিঁকে আছে। নয়ত তাদের আমলের সেই ম্যামথ ও খড়্গদন্তী বাঘদের মত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কৃত্রিম বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষের অবিবেচনার ফলে আজ উদ্ভিদজগতের উঠেছে নাভিশ্বাস। নিত্য-নৈমিত্তিক চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বনভূমির অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। অথচ ভৌত পরিবেশকে ঠিক রাখতে প্রাণীদের তুলনায় অন্তত ৯০ গুণ উদ্ভিদ থাকার দরকার বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে উদ্ভিদেরা যে-যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা নিম্নে প্রদান করা হল।

(১) বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতা রক্ষা—

পূর্বে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বিভিন্ন উৎস থেকে বাতাসে পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা বড় অংশকে উদ্ভিদেরাই শোধন করে দেয়। পাতার সবুজকণা সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অঙ্গারকে গ্রহণ করে এবং বাতাসকে উপহার দেয় অক্সিজেন।

(২) নাইট্রোজেন চক্রে অংশগ্রহণ—

বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাধিক—শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগের মত। আবর্জনা, মল-মূত্র, মৃত জীব ও উদ্ভিদদেহ প্রভৃতি থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বাতাসে মিশে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। তেমনই আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণে কিছু কিছু নাইট্রোজেন বাতাসে অবস্থিত অন্য একটি উপাদান অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। এটি জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। তাই বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডের আকারে মাটিতে নেমে আসে। মাটিতে বসবাসকারী এক ধরনের ব্যাক্টিরিয়া উদ্ভিদের খাদ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়ায় উদ্ভিদ ওর নাইট্রোজেনকে

গ্রহণ করে প্রোটিন উৎপাদন করে। কিছু কিছু উদ্ভিদ আবার শেকড়ে এক ধরনের ব্যাক্টিরিয়াকে আশ্রয় দেয় এবং সেই ব্যাক্টিরিয়ারা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করে দেয়। উক্ত কারণে বাতাসে নাইট্রোজেনেরও সমতা রক্ষা করে উদ্ভিদ।

(৩) পরিবেশকে ধূলাবালি মুক্তকরুণ—

কেবল ধূলাবালি নয় অনেক বিষাক্ত গ্যাস, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাই ও কয়লার কণা—যেগুলো বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে তাদের বহুলাংশকে উদ্ভিদ পাতায় আটকে ফেলে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের পাতা যেন ছাঁকনির কাজ করে। এবং পাতার উপরে ও তলদেশে ধূলাবালির একটা আস্তরণ গড়ে তোলে। যে-সব গাছের পাতায় রোঁয়া আছে সেগুলি একাজে আরও উপযুক্ত।

বাতাস থেকে ধূলিকণা সংগ্রহের ক্ষমতা সব উদ্ভিদের সমান নয়। কারও বেশি কারও কম। আমাদের দেশীয় গাছ-গাছড়ার মধ্যে অশ্বত্থ ও বট পাতার ধূলিধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। ওরা প্রতি বর্গমিটার আয়তনে যথাক্রমে উপরের পিঠে ৬·৫ গ্রাম এবং ৬·২ গ্রাম, তলার অংশে ৩·৪ গ্রাম ও ৩ গ্রাম ধূলিধারণ করতে পারে। আম, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির পাতাও বড় কম ধূলি ধারণ করে না। প্রতি বর্গমিটারে আমপাতা উপরে ও নিচের পিঠে ৩·৪ গ্রাম ও ৩·৩ গ্রাম, কৃষ্ণচূড়া ২·৮ গ্রাম ও ১·৬ গ্রাম, দেবদারু ২·২ গ্রাম ও ১ গ্রাম ধূলি ধারণ করতে পারে।

(৪) শব্দ দূষণ রোধ—

শ্রেণীবদ্ধ গাছপালা উচ্চশব্দের তীব্রতা কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় ১০ ডেসিবেলের মত শব্দকে কমিয়ে ফেলে গাছের শ্রেণী।

(৫) বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ—

উদ্ভিদ মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে উদ্ভিদের চারপাশে ছোট ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ছিদ্রপথে জল গেলে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য যে জলকে গ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়।

ওতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয় এবং বৃষ্টিপাতের সুবিধা হয়।

উদ্ভিদ না থাকলে সমূহ জল গড়াতে গড়াতে নদীতে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় প্রচুর পলিমাটি। ওতে নদীবক্ষ অগভীর হয়ে পড়ে। অল্প জলেও নদীতে বন্যা দেখা দেয়।

(৬) ভূমির ক্ষয়রোধ—

উদ্ভিদ তার শেকড়ের সাহায্যে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখে। ফলে উপরের মাটির স্তর বৃষ্টির জলে ধুয়ে পলির সৃষ্টি করতে পারে না। গাছপালা না থাকলে মাটির ক্ষয় হবে এবং উপরের ভাল স্তরটা ধুয়ে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে কঠিন শিলাস্তর। যা কৃষির পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়।

(৭) জলের দূষণ রোধ—

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে, যারা শেকড়ের সাহায্যে জলে প্রলম্বিত শক্ত পদার্থ এমনকি ধাতবকণাকে শেকড়ে ধারণ করতে পারে। কচুরি-পানা এইজাতীয়।

উক্ত কারণগুলির জন্য কৃত্রিম বনসৃজনের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ করা উচিত। বড় গাছের ক্ষমতা অবশ্য অধিক। উক্ত কারণে বড় বড় গাছকে ছেদন করা আদৌ উচিত নয়।

কয়েকটি তালিকা

তালিকা—১

[দূষক-পদার্থ, তাদের উৎস এবং প্রতিক্রিয়া]

দূষক পদার্থ	উৎস	প্রতিক্রিয়া	ক্ষতিকর মাত্রা
কার্বন ডাই-অক্সাইড	(১) কলকারখানার ধোঁয়া, (২) জালানীর দহন, (৩) অগ্ন্যুৎপাত, (৪) জীব ও উদ্ভিদদেহের পচন, (৫) চুনাপাথর, (৬) জীব ও উদ্ভিদের শ্বাসকার্য, (৭) প্রস্রবণ।	(১) শ্বাস গ্রহণে কষ্ট (২) পৃথিবীতে উত্তপ্ত পরিবেশ	—
কার্বন মন-অক্সাইড	(১) মোটরগাড়ীর ধোঁয়া (২) যে-কোন পুরাতন ইঞ্জিনের ধোঁয়া (৩) তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা (৪) জালানীর দহন	অক্সিজেন অপেক্ষা ওর রক্তের সঙ্গে ৩০০ গুণ বেশী মেশার ক্ষমতা থাকায় শ্বাসের সঙ্গে গিয়ে অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন মন-অক্সাইড রক্তের সঙ্গে ক্রিয়ায় গঠন করে কারবোক্সি হিমোগ্লোবিন। এতে মৃত্যু অনিবার্য।	বাতাসে এক লক্ষ ভাগে ৩৩ ভাগ

দূষক পদার্থ	উৎস	প্রতিক্রিয়া	ক্ষতিকর মাত্রা
হাইড্রোকার্বন (মিথেন, ইথেন, অ্যাসিটিলিন, প্রভৃতি)	(১) মোটরগাড়ীর ধোঁয়া (২) তৈল শোধনাগার (৩) নানা প্রকারের জ্বালানী	নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে অ্যালডিহাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট তৈরি করে। এতে ত্বকের ও ফুসফুসের রোগ হয়। ইথিলিন ওজোনের সঙ্গে যে ফরমালডিহাইড গঠন করে তাতে চোখের রোগ হয়।	বাতাসে এক লক্ষ ভাগে ৫০০ ভাগ
সালফার ডাই-অক্সাইড	(১) তৈল শোধনাগার (২) কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানীর দহন (৩) বিভিন্ন কলকারখানা (৪) আতসবাজির ধোঁয়া	অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটায় এবং বিস্তীর্ণ এলাকার উদ্ভিদকে বিনষ্ট করে, পুরাকীর্তিগুলিকে নষ্ট করে।	এক লক্ষ ভাগে এক ভাগ
হাইড্রোজেন সালফাইড	(.) তৈল শোধনাগার, (২) বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা, (৩) পচা মাছ, মাংস ও ডিম	শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ধাতব পদার্থের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস।	—

দূষক পদার্থ	উৎস	প্রতিক্রিয়া	ক্ষতিকর মাত্রা
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	(১) খনিজ কয়লার দহন, (২) অ্যাসিড তৈরির কারখানা, (৩) প্লাস্টিক শিল্প	নানাপ্রকার রোগের উৎস ও উদ্ভিদের পক্ষে বেজায় ক্ষতিকর।	—
ক্লোরিন	প্রধানত কীটনাশক থেকে। ফসফেট সার, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার কারখানা	ক্যানসারের উৎস, ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তরের ক্ষতি।	অতি বিষাক্ত
নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি (NO, NO_2, N_2O, ইত্যাদি)	(১) মোটরগাড়ীর ধোঁয়া, (২) জেট বিমানের ধোঁয়া, (৩) আবর্জনা, (৪) রাসায়নিক কারখানা	ঊর্ধ্বাকাশে ওজোনের স্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে, ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে, চোখ-মুখ-গলা ও ফুসফুসের রোগ।	লক্ষ ভাগে ১৫ ভাগ
বেঞ্জিন	পেট্রোলিয়াম পাম্প থেকে	নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিবিভ্রম	লক্ষ ভাগে ১ ভাগ
ধূলিকণা	(১) মাটির ক্ষয়, (২) গাড়ীর চাকার ঘর্ষণ	ধোঁয়াশা ও অ্যালার্জিঘটিত রোগ	—
ক্লোরোবেনজিন	সিগারেটের ধোঁয়া	ক্যানসার সৃষ্টির মাধ্যম	—
ওজোন	বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের আধিক্যে	স্বাস্থ্য হানি ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের রোগ।	এক লক্ষ ভাগে ০·২ ভাগ

তালিকা—২

[বিভিন্ন উৎস থেকে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার প্রকার ও ওজন]

আবর্জনার উৎস	প্রকার	ওজন
ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল	(১) গৃহজাত আবর্জনা বা গারবেজ. (২) ছাই, রাবিশ, ভাঙ্গা কাচ, ধাতুর টুকরা ইত্যাদি, (৩) তরিতরকারির খোসা।	(১) গারবেজ ৪৫০-৯০০ কিগ্রা প্রতি ঘন মিটারে, (২) ছাই ৭০০-৮৫০ কিগ্রা প্রতি ঘন মিটারে, (৩) রাবিশ ৫০-৪০০ কিগ্রা প্রতি ঘন মিটারে।
কলকারখানা	প্রচুর জৈব ও অজৈব পদার্থ।	বিভিন্ন কারখানা এলাকায় ওজন বিভিন্ন, কোন কোন জায়গায় কয়েক হাজার কিগ্রা প্রতি ঘন মিটারে।
গাড়ী মোটর	রাস্তার ধূলা	৭৫০-৮৫০ কিগ্রা প্রতি ঘন মিটারে।

তালিকা – ৩

[শব্দের উৎস ও শব্দমান]

শব্দের উৎস	শব্দমান	শব্দের উৎস	শব্দমান
জেটবিমান ওঠার সময়	১৯০	চিৎকার, চেঁচামেচি	১০০
জেট উড়তে থাকায়	১৪০	রেলগাড়ী, ড্রিলমেসিন	৯০
অ্যাম্পলিফায়ার	১৩০	ট্রাকটর, ভারী যন্ত্রপাতি	৮০
গাড়ীর হর্ন (১ মিটার তরঙ্গে)	১১০	হালকা যন্ত্রপাতি	৭০
কোলাহলপূর্ণ স্থান	১০০	মোটরগাড়ী	৭৪

৫০ বছর বয়সের যে-কোন একটি গাছের প্রকৃত অর্থমূল্য ঃ—

১। বাতাসকে অক্সিজেন উপহারের মূল্য — ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

২। জীবজন্তুকে প্রোটিন সরবরাহের মূল্য — ২০ হাজার টাকা

৩। আবহাওয়াকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ধূলাবালিকে মুক্ত করার মূল্য — ৫ লক্ষ ০ হাজার টাকা

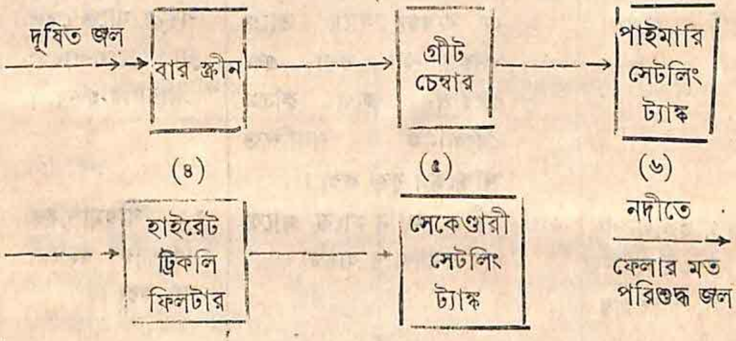
৪। মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধির মূল্য— ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৫। বৃষ্টিপাত, কৃত্রিম উপায়ে করতে খরচ — — — ৩ লক্ষ ০ হাজার টাকা

মোট — ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

তাছাড়া কত রকমের উদ্ভিদ, পোকামাকড় ও জীবজন্তুকে আশ্রয় দেয়। তারও একটা মূল্য আছে।

নর্দমাবাহিত আবর্জনাকে বিশোধন করার নীতি ঃ—



(১) লোহার ছাঁকনির ভেতর দিয়ে পরিবহণের ফলে বড় মাপের শক্ত পদার্থ পৃথক হয়।

(২) কাঁকরের স্তর দিয়ে চুইয়ে নেওয়ায় ভাসমান অজৈব পদার্থ, তেল, চর্বি প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

(৩) প্রাথমিক থিতানো ব্যবস্থায় জৈব কণা থিতিয়ে পড়ে।

(৪) উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফিলটারে ছেঁকে নেওয়ায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জৈব ও অজৈব পদার্থ মুক্ত হয়।

(৫) সর্বশেষ থিতানো স্তরে কলয়েড জাতীয় পদার্থ দূরীভূত হয়।

(৬) নদীতে ছেড়ে দেওয়ার মত পরিশুদ্ধ জল।

তালিকা—৪

[বিভিন্ন উৎসের জলের দূষণ যেভাবে রোধ করা যায়]

পুকুরের জল	নদীর জল	সমুদ্রের জল
১। আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা।	১। অন্তত পঞ্চাশ মাইল প্রবাহের মধ্যে কোন আবর্জনা ইত্যাদি যেন যুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।	১। নদীসমূহের দূষণ রোধ করা।
২। কাছাকাছি গোয়াল, পায়খানা, নর্দমা ইত্যাদি না রাখা।	২। নদীর জলে স্বাভাবিক-ভাবে অক্সিজেন তৈরির যে ব্যবস্থা আছে তাকে ব্যাহত না করা এবং প্রয়োজন হলে কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন যুক্ত করা।	২। তৈলবাহী ট্যাঙ্কার থেকে সমুদ্রে যাতে তেল না পড়ে সে-ব্যবস্থা জোরদার হওয়া।
৩। পাড়ে গাছপালা না রাখা এবং উদয়-অস্ত রোদ পাওয়ার ব্যবস্থা।	৩। নদীর তলানি মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা।	৩। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো বন্ধ করা।
৪। পানা জমতে না দেওয়া।	৪। নদীর বুকে আগাছা ও শেওলাকে জমতে না দেওয়া।	৪। সমুদ্রের মহী-সোপান থেকে তেল উত্তোলনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা।

পুকুরের জল	নদীর জল	সমুদ্রের জল
৫। কীটনাশক ও ফসফেট জাতীয় সারকে পড়তে না দেওয়া।	৫। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থগুলি ও গরম জলকে সরাসরি নদীতে নিক্ষেপ না করা।	
৬। কৃষিক্ষেত্রের জলকে আসতে না দেওয়া।	৬। নদীর তীরে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ করা।	
৭। ডি. ডি. টি. থেকে মুক্ত রাখা।	৭। নর্দমাবাহিত শহরের আবর্জনাকে বিশোধন করার পর পরিশুদ্ধ জলকে নদীতে ফেলা।	
৮। মাঝে মাঝে চুন, পটাস পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি জলে দেওয়া।		

তালিকা—৫

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি প্রতিবছর পৃথিবীর মাটিতে যে-সমস্ত ক্ষতিকর উপাদান ছড়াচ্ছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে উড়ন্ত ছাইর পরিমাণ—বছরে ১৩০০০০ টন।

ছাইর উপাদান	ছাইতে শতকরা পরিমাণ
সিলিকন	৫২·০০
সালফেট লবন	০·৩৬
লোহার বিভিন্ন অক্সাইড	২৬·০০
অ্যালুমিনা	১৬·০০
ফসফরাস পেণ্টোঅক্সাইড	·৪০
টাইটেনিয়াম অক্সাইড	১·৮০
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	১·১৩
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	·৪৯
পটাসিয়াম অক্সাইড	১·২৮
সোডিয়ামের বিভিন্ন অক্সাইড	০·২৮

তালিকা—৬

[কয়লার উড়ন্ত ছাইতে ক্ষতিকর মৌলিক পদার্থের পরিমাণ]

ক্ষতিকর মৌল প্রতি এক মিলিয়ন টনে	পরিমাণ টনে	ক্ষতিকর মৌল প্রতি এক মিলিয়ন টনে	পরিমাণ টনে
সোডিয়াম	১·৩	ল্যানথেনিয়াম	০·২৩
পটাসিয়াম	১৮·২	থোরিয়াম	০·০২
পারদ	·০৪৮	ক্রোমিয়াম	০·৪
দস্তা	২·০	হফনিয়াম	০·৩
লোহা	১০·৬·৬	সিরিয়াম	০·১৪
কোবাল্ট	০·১২		

তালিকা—৭

[ভারতের বিভিন্ন শহরে ধূলাবালির পরিমাণ]

শহর	পরিমাণ (মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে)
বোম্বাই	২৪০·৯
কলিকাতা	৩৪০·৭
দিল্লী	২০০·০
কানপুর	৫৪৩·৫
মাদ্রাজ	১০০·৯
নাগপুর	২৬১·৬
হায়দরাবাদ	১৪৬·২
জয়পুর	১৪৬·১